এক

বাঙালীর নাট্যচেতনার স্বরূপ ও তার সাহিত্যিক প্রকাশ

॥ ১ ॥

একথা সর্বজনবিদিত যে, উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই আধুনিক বাংলা নাটকের সূত্রপাত। এর সঙ্গে ঐতিহ্যের কোন মেলবন্ধন হয়নি। মূলতঃ পাশ্চাত্য শিক্ষার সংসর্গে উনিশ শতকের বাঙালী-মানস নাট্যরচনা ও মঞ্চাভিনয়ের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। তাহলেও আমাদের অতীত যুগের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপের প্রয়োজন আছে। কেননা, ইতিপূর্বে প্রচলিত বাংলা নাটগীতি ও যাত্রা এবং তজ্জাতীয় শিল্পকলার বৈশিষ্ট্য আলোচনা-সূত্রেই মোটামুটিভাবে বাঙালীর নাট্য-চেতনার বিশিষ্টরূপ ও চাহিদাটি আমরা উপলব্ধি করতে পারব।

বাংলা নাটকের উৎস-সন্ধানে যেকালে 'উক্তি-প্রত্যুক্তি-বন্ধ-যুক্ত' রচনা দেখা দিয়েছিল অর্থাৎ যখন দৃশ্য-কাব্যজাতীয় পদ রচনা আরম্ভ হয়েছিল, সেকালে আমাদের গিয়ে পৌঁছুতে হবে। সংস্কৃত সাহিত্যে নাটকের অভাব ছিল না এবং সে-নাটকগুলি মহাসমারোহে অভিজাত মহলে এককালে অভিনীতও হত। নাট্যশাস্ত্র সম্পর্কে পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থও সংস্কৃতে রচিত হয়েছিল। সে-যুগের প্রতিনিধি স্থানীয় নাট্যকারদের মধ্যে ভাস, কালিদাস, শূদ্রক, ভবভূতি প্রভৃতি নাম সর্বজনশ্রুত। কিন্তু কালক্রমে এই সংস্কৃত নাটকের ধারা স্তিমিত হয়ে পড়ল অথচ আঞ্চলিক ভাষায় নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে সংস্কৃত নাটক মূলতঃ কোন প্রেরণা যোগাতে পারল না। অভিজাত শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় লালিত সংস্কৃত নাটকের রসাস্বাদন থেকে দেশের বৃহত্তর জনজীবন যেমন বঞ্চিত ছিল তেমনি যথেচ্ছ পরিমাণে অলংকৃত ও বাগ্‌বৈদগ্ধ্যপূর্ণ সংস্কৃত নাটকের আস্বাদন-যোগ্যতাও সর্বশ্রেণীর জনগণের থাকা সম্ভব ছিল না। বিশেষতঃ সংস্কৃত নাটকে দৈনন্দিন জীবনাচরণ অপেক্ষা অতি উচ্চ ভাবাদর্শের নাট্যায়নই প্রাধান্য লাভ করেছিল। শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' এক্ষেত্রে একটি আশ্চর্য ব্যতিক্রম হিসেবে উল্লেখযোগ্য। সুতরাং মুষ্টিমেয় পণ্ডিত ও বিদ্বান ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে সংস্কৃত নাটক প্রকৃতপক্ষে দেশের বৃহত্তর জনগণের নাট্যরসপিপাসাকে অপরিতৃপ্তই রেখেছিল।[১]

বর্ণাঢ্য ও অত্যুজ্জ্বল এসব সংস্কৃত নাটকের পাশে পাশে লোকজীবনে নাট্যরসপিপাসা চরিতার্থ করবার একটা প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই চলেছিল। বৈদিক যুগ থেকেই লৌকিক নৃত্য-গীতাভিনয়ের কথা জানা যায়। বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবাদিকে উপলক্ষ করে আনন্দানুষ্ঠান

ও নৃত্যগীত বহু প্রাচীনকাল থেকেই এদেশে প্রচলিত ছিল। কালক্রমে এরই সূত্র ধরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে লোকাভিনয়ের ঐতিহ্য গড়ে উঠতে থাকে[২]। ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চল—বাংলাদেশেও স্বতন্ত্র ধারায় লোকাভিনয়ের একটি ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল অনুমান করতে পারি। আর এসব অভিনয় যে সাজসজ্জা সহযোগেই সম্পন্ন হত এমন ইঙ্গিতও প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের দু'এক জায়গায় আছে। চর্যাপদের একটি গানে 'নটপেটিকা'র উল্লেখ এ-প্রসঙ্গে স্মর্তব্য (নড়এড়া<নটপেটক, অর্থ নটসজ্জা। ১০নং পদ)। বাংলাদেশে মুসলমান অভিযানের আগে যে এদেশে নৃত্য-গীতময় একশ্রেণীর নাটগীত প্রচলিত ছিল তার ইঙ্গিত চর্যাপদেরই একটি গানে পাওয়া যায়। নৃত্যগীত সহযোগে 'বুদ্ধনাটকে'র অভিনয়ের ইঙ্গিত করে সিদ্ধাচার্য বীণাপাদ একটি পদ রচনা করেছেন।

"নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী।
বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই॥"[৩]

'গীতগোবিন্দ' ও পরবর্তী কালের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এই নাটগীতি শ্রেণীর গীতিকাব্য। এছাড়া রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ ও ধর্মমঙ্গল কাব্যসমূহে ধর্মপূজা উপলক্ষে গীতবাদ্য ও নৃত্যানুষ্ঠানের উল্লেখ আছে। মধ্যযুগে কোন কোন লৌকিক দেবদেবীর পূজা উপলক্ষে নৃত্যগীতাদি অনুষ্ঠানের প্রচলন ছিল বলে জানা যায়।[৪] কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক ধামালী ও ঝুমুর গানের নৃত্য গীতাদি সেই প্রাচীন ঐতিহ্যেরই অনুসরণ করে চলেছিল।

কিন্তু আশ্চর্য ও দুঃখের বিষয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত আমরা বাংলা নাট্য-সাহিত্যের কোন নিদর্শন পাই না। এমনকি, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নাটগীতির উল্লেখ এবং মধ্যযুগের প্রাণপুরুষ শ্রীচৈতন্যদেবের সপার্ষদ কৃষ্ণলীলাভিনয়ের বিবরণ ছাড়া আর কোন মঞ্চাভিনয়ের কথাও আমাদের জানা নেই। অথচ বাংলাদেশেরই আশেপাশে তখন নাটক-রচনা ও মঞ্চাভিনয়ের সুমহতী প্রচেষ্টা চলেছে। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রাক্কালে বাংলাদেশ যখন তুর্কীদের দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন থেকেই মিথিলা বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনভাবে অবস্থান করে। তুর্কী আক্রমণোত্তর বাংলাদেশের প্রায় দু'শ বছর অন্ধকারাচ্ছন্ন। কিন্তু পার্শ্ববর্তী মিথিলায় তখন সাহিত্য-সংস্কৃতির ব্যাপক অনুশীলন চলেছে। এসময় সেখানে যেমন কাব্য-কবিতা রচিত হচ্ছে তেমনি রচিত হচ্ছে নাটক।[৫] বিদ্যাপতির 'গোরক্ষবিজয়' নাটক, উমাপতি ওঝার 'পারিজাত হরণ নাটক' অথবা শেখরাচার্যের 'ধূর্তসমাগম' প্রহসন তখন মিথিলায় অভিনীত হয়েছে। ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চল আসামের সাধক শঙ্করদেবের একাধিক অসমীয়া নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। শঙ্করদেব রচিত 'রামবিজয়,' 'রুক্মিণী হরণ,' 'কেলিগোপাল' প্রভৃতি ছয়খানি 'অঙ্কিয়া নাট' তখন রীতিমতো দৃশ্যপটাদি সহযোগে মঞ্চাভিনীত হয়েছে। নীলাচলে অবস্থানকালে

মহাপ্রভু রায় রামানন্দের 'জগন্নাথ বল্লভে'র অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। এমনকি নেপালেও এসময় মঞ্চাভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায়। গোপীচন্দ্র-ময়নামতীর কাহিনী নিয়ে রচিত 'গোপীচন্দ্র' নাটকসহ যে কয়খানি নাটক নেপালে পাওয়া গেছে, তাও নেপালের অভিজাত সমাজে মঞ্চাভিনয়ের রীতিতেই পরিবেশিত হয়েছিল।[৬] যখন বাংলাদেশের চারপাশেই নাট্যরচনা ও নাটকাভিনয়ের আসর জমজমাট তখন একমাত্র বাংলার নাট্য-সাহিত্যের জগৎ অন্ধকারময়। অথচ এসময় বাংলার কাব্যসাহিত্যের আকাশ আলোকোজ্জ্বল। মঙ্গলকাব্যের বহুমুখী শাখা পত্রে-পুষ্পে বিকশিত হয়ে উঠেছে, রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত প্রভৃতি অনুবাদ-অনুশীলনও ব্যাপকতা লাভ করেছে। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবে বাংলাদেশের গীতিসাহিত্যও পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে, অথচ এসময় বাংলা সাহিত্যে নাট্যচর্চা একেবারেই বিস্ময়করভাবে অনুপস্থিত। কিন্তু সুধীজন যে নাটক সম্পর্কে একেবারেই অনবহিত ও নিস্পৃহ ছিলেন এমন মনে হয় না। শ্রীচৈতন্যদেবের সমকালেই কয়েকটি সংস্কৃত নাটক রচিত হয়েছিল। শ্রীরূপ গোস্বামী লিখেছিলেন 'ললিত মাধব' এবং 'বিদগ্ধমাধব' নাটক দুটি। নাটক দুটির কবিত্ব ও নাটকীয়তা ভক্তগণসহ মহাপ্রভুর প্রশংসা লাভ করেছিল। মহাপ্রভুর নীলাচলে অবস্থান কালেই 'বঙ্গদেশী এক বিপ্র' শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন অবলম্বনে একটি সংস্কৃত নাটক রচনা করে শ্রীচৈতন্যদেবকে পরিবেশন করবেন বলে শ্রীক্ষেত্রে গিয়েছিলেন। নাটকটি মহাপ্রভুর কাছে উপস্থিত করা যায়নি কারণ ঐ নাটকে মহাপ্রভুর প্রশংসা করা হয়েছিল যা শুনলে মহাপ্রভু স্বভাবতঃই বিরক্ত হতে পারতেন। নাটকটি উপস্থিত ভক্তগণের প্রশংসা লাভ করলেও মহাপ্রভুর আস্বাদনযোগ্যতা লাভ না করায় লুপ্ত হয়েছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস এ-বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ তাঁর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন।[৭]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবিরা সংস্কৃত নাটক রচনা করেছিলেন। ভারতচন্দ্র সংস্কৃতে 'চণ্ডী নাটক' রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।[৮] কিন্তু ভারতচন্দ্র এই নাটকটি কি উদ্দেশ্যে রচনা করেছিলেন তা আজ আর জানবার উপায় নেই। কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় কোন নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল কি না সন্দেহ। শ্রীরূপ গোস্বামীর নাটকদ্বয়ও অভিনীত হয়নি। নাটক দুটি শ্রীরূপ মহাপ্রভু, রায় রামানন্দ ও ভক্তগণমণ্ডলীতে পাঠ করেছিলেন বলে কৃষ্ণদাস উল্লেখ করেছেন। উক্ত দুটি নাটক ছাড়া শ্রীরূপ আরও একটি একোক্তি নাটক (ভাণিকা) 'দানকেলী কৌমুদী' রচনা করেছিলেন। নাটকটির বিষয় শ্রীকৃষ্ণের ঘাটদান লীলা।

শ্রীচৈতন্যের জীবিতকালেই 'বঙ্গ দেশীয় বিপ্রের' রচিত শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন অবলম্বনে রচিত নাটকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ-বিষয়ে দ্বিতীয় নাটক চৈতন্য ভক্ত শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র 'কবি-কর্ণপূর' পরমানন্দ কর্তৃক রচিত সংস্কৃত নাটক 'চৈতন্য চন্দ্রোদয়'।

নাটকটি শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের অল্পকাল পরই রচিত হয়েছিল। মহাপ্রভুর জীবনাবলম্বনে সর্বমোট দশটি অঙ্কে এই নাটকটি সম্পূর্ণ।

চৈতন্যসমকালে রচিত উল্লিখিত সংস্কৃত নাটকগুলি অথবা অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবিগণের রচিত সংস্কৃত নাটক কোনটিই মঞ্চস্থ হয়েছিল বলে আমাদের জানা নেই। সমগ্র মধ্যযুগে বাংলাদেশে মঞ্চাভিনয়ের অনুপস্থিতির মূল কারণ সম্ভবতঃ রাজানুকূল্যের অভাব। কারণ, এ-সময় বাংলাদেশের রাজা-মহারাজা বা জমিদারদের রাজসভায় সাহিত্য শিল্প এমনকি সঙ্গীতের চর্চা হলেও নাট্যচর্চার কোন উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। বাংলাদেশের মধ্যযুগের এই দীর্ঘ কাল-সীমায় নাট্য-চর্চার অভাব কেন? তুর্কী আক্রমণোত্তর বাংলাদেশে ইংরাজ আধিপত্যের পূর্ব পর্যন্ত একমাত্র লৌকিক নাটগীত ও যাত্রাভিনয় ছাড়া মঞ্চাভিনয়ের কোন সংবাদই নেই। অথচ এদেশেই মুসলমান আধিপত্যের আগে 'সেন' আমল পর্যন্তও পৌরাণিক-অপৌরাণিক নানা বিষয় অবলম্বনে নাটক রচিত হয়ে এসেছে। এমন কি সংস্কৃত নাট্যরীতি-পদ্ধতির (নাটক-নাটিকা-প্রহসন-প্রকরণ ইত্যাদি) বাইরেও বিভিন্ন রীতির অজস্র নাটক লিখিত হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন সাগর নন্দী তাঁর 'নাটক লক্ষণ রত্নকোশ' নামক নাট্যশাস্ত্র-বিষয়ক গ্রন্থে।[৯] এমনকি লক্ষ্মণসেনের সভাকবি জয়দেবের 'গীত গোবিন্দ'ও নাট্যলক্ষণাক্রান্ত। এ-সময় রাজানুগ্রহে সংস্কৃত নাট্যরচনাপ্রয়াস ছাড়া লোকজীবনে নৃত্য গীতাভিনয় যে প্রচলিত ছিল তারও নানা ইঙ্গিত আছে। কিন্তু বাংলাদেশে মুসলমান আধিপত্য বিস্তারের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সাহিত্য-শিল্পের এই ধারাটিকে দীর্ঘকালের জন্য পশ্চাদপটে সরে যেতে দেখি। একথা সত্য যে, মুসলমান আধিপত্যের কালে বাংলা নাট্যসাহিত্যের বিকাশ ব্যাহত হয়েছে। সম্ভবতঃ, মুসলমান শাসকগণ এই শিল্পচর্চাকে তাঁদের ধর্মশাস্ত্র বিগর্হিত বলে সুনজরে দেখেননি।[১০] মুসলমান শাসকগণের উৎসাহ ও আনুকূল্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অন্যান্য শাখার প্রসার ও পুষ্টিলাভ ঘটলেও উল্লিখিত কারণেই নাট্য-চর্চা তাই পণ্ডিত সমাজে অবহেলিত হয়েছে। শুধু বাংলাদেশে নয়, মুসলমান অধিপতিগণ কোথাও নাট্যসাহিত্যের বিকাশে সহায়তা করেছেন এমন শোনা যায় না।[১১] নাট্য-চর্চার প্রতি মুসলমান শাসকগণের প্রবল অনীহা ও নিরুৎসাহ ছাড়া অন্যান্য কারণও সম্ভবতঃ জড়িত ছিল। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ঐ জাতীয় নাট্যকলার চর্চাও ক্রমে ক্রমে অপ্রচলিত হয়ে পড়ল।[১২] অথবা, এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে, "বাঙালীর সাংস্কৃতিক সংস্থা তখন এমন ছিল যাহাতে নাটক সৃষ্টির প্রেরণা সে পায় নাই। বিশেষতঃ 'মঞ্চ অভিনয়' রীতির সহিত বিশেষ পরিচয় যে বাঙালীর ঘটে নাই এরূপ অনুমান না করিয়া উপায় নাই।"[১৩]

সুতরাং একথা অনস্বীকার্য যে, বাংলা নাটকের অভাব ও মঞ্চাভিনয়ের অনুপস্থিতি বাংলা নাটকের ঐতিহ্য বিষয়ে আলোচনার একটা বড় অন্তরায়। তাই এই বাধাকে অতিক্রম করে এ-যুগের নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস রচনায় নাট্যলক্ষণাক্রান্ত যে উপাদানগুলির ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তাহল ১. জয়দেবের 'গীত গোবিন্দ,' ২. চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন,' ৩. মঙ্গল কাব্যসমূহ ও রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি পাঁচালী গ্রন্থসমূহ, ৪. শ্রীচৈতন্য জীবনী গ্রন্থাদি ও কবিকর্ণপূরের নাটক, ৫. বৈষ্ণব পালা কীর্তন, ৬. পল্লীগীতিকাসমূহ, ৭. নেপাল থেকে সংগৃহীত মধ্যযুগের কতিপয় বাংলা নাটক ও ৮. সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে অনুষ্ঠিত যাত্রার বিবরণ ও যাত্রা নাটকসমূহ। উক্ত উপাদানের সঙ্গে ক্ষেত্র বিশেষে ঘটনা ও বর্ণনার অনুষঙ্গে অনুমান প্রমাণের উপর নির্ভর করেই এ-যুগের বাংলা নাটকের ইতিহাস ও বাঙালীর নাট্যস্বভাবের স্বরূপ আমাদের আলোচনা করতে হবে।

॥ ২ ॥

বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'ই বাংলা ভাষায় প্রথম নাট্যসম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন 'গীতিনাট্য শ্রেণীর গীতিকাব্য'।[১৪] কিন্তু এই জাতীয় 'গীতিনাট্য শ্রেণীর গীতিকাব্য' রচনায় জয়দেব বড়ু চণ্ডীদাসের পূর্বসূরী। 'গীতগোবিন্দে'ই সর্বপ্রথম কৃষ্ণ-লীলার নাট্যরূপের সন্ধান পাওয়া যায়।[১৫] গীতগোবিন্দ মূলতঃ রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা-বিষয়ক সর্গবদ্ধ গীতিকাব্য। কিন্তু এই কাব্যে রাগ ও তালের নির্দেশ থেকে একথাই মনে হয় যে, এই কাব্যটি নৃত্য-গীতাভিনয়ের জন্যও ব্যবহৃত হত। গীতগোবিন্দ যদিও সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রসম্মত মহাকাব্যোচিত রীতিতেই রচিত হয়েছে তবুও এর অন্তর্নিহিত নাট্যলক্ষণটি একেবারে গোপন থাকেনি।[১৬] রাধা-কৃষ্ণ ও সখী মূলত এই তিনটি চরিত্রকে অবলম্বন করে মোট চব্বিশটি গানে এই কাব্যটি সম্পূর্ণ। রাধার অজ্ঞাতে কৃষ্ণ অন্যগোপীর সঙ্গে মিলিত হওয়ায় রাধা অভিমানিনী হয়েছেন। রাধা কর্তৃক ভর্ৎসিত ও পরিত্যক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের মনে নির্বেদ উপস্থিত হয়। সখীদূতীর সহায়তায় রাধা-কৃষ্ণের পুনর্মিলন—এই কাহিনীবস্তুকে অবলম্বন করেই গীতগোবিন্দের কাব্যদেহ পরিকল্পনা। নৃত্য গীতময় এই গীতিকাব্যটিতেই পরবর্তী কালের যাত্রার বীজ নিহিত ছিল বলে পণ্ডিত-গণ অনুমান করেছেন।[১৭] কারণ, উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত যাত্রায় এই নৃত্যগীতের ধারাকে আমরা অনুসৃত হতে দেখেছি। কিন্তু কোন কোন সমালোচক এই 'গীতগোবিন্দে' নাটকীয়তা অপেক্ষা মহাকাব্যোচিত স্বভাব বর্ণনারই প্রাধান্য লক্ষ্য করেছেন।[১৮]

গীতগোবিন্দের ঐতিহানুসরণে রচিত পরবর্তী উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বড়ু চণ্ডীদাসের

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। রাধা-কৃষ্ণ এবং বড়াই মোট এই তিনটি চরিত্রকে অবলম্বন করে তেরটি খণ্ডে এই কাব্যটি সম্পূর্ণ। ঘটনা বিবৃতি, নাট্যরস ও গীতিরস এই ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্যে কাব্যটি মণ্ডিত। অবশ্য সঙ্গীতময়তা ও ঘটনাবর্ণনার চাইতে প্রাধান্য লাভ করেছে নাটকীয়তা। কবির যথার্থ নাট্যকারসুলভ নৈর্ব্যক্তিকতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রাধা-কৃষ্ণ ও বড়াই মূলতঃ এই তিনটি চরিত্রের উক্তি-প্রত্যুক্তি দ্বারাই ঘটনা পরিণতিমুখী হয়েছে। কবি প্রয়োজনবোধে স্থানে স্থানে একের উক্তির সঙ্গে অপরের উক্তির সংযোগসূত্র রচনা করে চলেছেন।

এই কাব্যের সর্বপ্রথম নাটকীয় পাত্র-পাত্রীর উক্তি-প্রত্যুক্তিতে সঙ্গীতের ব্যবহার লক্ষ্য করি। অতএব গীতগোবিন্দে যাত্রার সাঙ্গীতিক রীতির যে অঙ্কুর দেখা দিয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তাই স্ফুটতর ও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গীতগোবিন্দে যদি নাটকীয়তা অপেক্ষা কবিত্ব প্রাধান্য পেয়ে থাকে তাহলে বলতে হয় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কবিত্ব অপেক্ষা নাটকীয়তারই আধিক্য। এ-প্রসঙ্গে সতীশচন্দ্র রায়ের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য—

> "শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নাটকীয় ঘটনারই প্রাধান্য দেখা যায়। কবি রাধা-কৃষ্ণ ও বড়াইর সরস ও সতেজ উক্তি-প্রত্যুক্তির দ্বারাই শ্রেষ্ঠ নাট্যকাব্যের ন্যায় সকল রস ও ভাবগুলি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। নাটকীয় উৎকর্ষে কৃষ্ণকীর্তন প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয়।"[১৯]

রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলাকে অবলম্বন করেই বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম নাট্যলক্ষণ বিকশিত হয়ে উঠেছিল। রাধা-কৃষ্ণের সংঘাতময় মর্মস্পর্শী প্রেমলীলার বৈচিত্র্য অভিজাত ও পণ্ডিত সমাজের সংকীর্ণ সীমা অতিক্রম করে দেশের আপামর জনসাধারণের চিত্তকে আকৃষ্ট করেছিল সন্দেহ নেই। সুতরাং অভিজাত পরিবেশে জয়দেব বা বিদ্যাপতি প্রমুখ কবিগণ যে কাব্যরচনা করেছেন সে-কাব্যে নাটকীয় গতিবেগ ও দুর্দমনীয় হৃদয়াবেগের ঝংকার সুপরিস্ফুট। বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে এই নাটকীয়তা আরও প্রকট। "নাটকের যে প্রধান লক্ষণ—প্রত্যেক পাত্র-পাত্রীর মুখে চরিত্রানুযায়ী ভাষার আরোপ—তাহাও রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াই-এর সংলাপে চমৎকারভাবে উদাহৃত হইয়াছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'কে শুধু কাব্য না বলিয়া গীতিনাট্য বা নাট্যগীতি বলাই অধিকতর সঙ্গত।"[২০]

শ্রীচৈতন্য বা তৎপরবর্তী যুগে নাটক-লক্ষণ যে আরও পরিণত হয়ে উঠেছিল সে-বিষয়ে আলোচনার আগে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে যে মঙ্গলকাব্য ও পাঁচালী জাতীয় রচনাগুলি প্রচলিত ছিল সে-প্রসঙ্গে আলোচনা করে নেওয়া ভাল। বিভিন্ন মঙ্গল বা পাঁচালী গানের মধ্যেও যথার্থ নাটকীয় উপাদান বিদ্যমান ছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মত বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর উক্তি-প্রত্যুক্তির মাধ্যমে যে এই মঙ্গল বা পাঁচালীর কাহিনী শ্রোতৃ-মণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থাপিত হত না একথা নিশ্চিত। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের পালাগুলি বা

রামায়ণ-মহাভারত পাঁচালীর ঘটনা জনসাধারণের কাছে কি পদ্ধতিতে পরিবেশিত হত তা অবশ্য এখন আর জানবার উপায় নেই। তবে অনুমান করা যায় যে, একজন গায়ক অঙ্গ-ভঙ্গী সহযোগে এই মঙ্গল বা পাঁচালীর ঘটনাকে দর্শকদের কাছে স্পষ্টতর করে তুলতেন। সুতরাং এদিক থেকে বিচার করলে মঙ্গল গান বা রামায়ণ-মহাভারত পাঁচালী গানের চাইতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেই নাট্যলক্ষণ সমধিক পরিস্ফুট। পরবর্তী কালে 'কৃষ্ণযাত্রা' জাতীয় লোকসঙ্গীতেও এই ধারার অনুসরণ লক্ষ্য করি পাত্র-পাত্রীর বেশ ধারণ না করেও নানান অঙ্গভঙ্গি সহযোগে সঙ্গীতময় উক্তি-প্রত্যুক্তিগুলির মধ্যেই পরবর্তী কালের যাত্রার পূর্বাভাস সূচিত হয়েছিল।

মঙ্গল ও পাঁচালীর গায়নপদ্ধতি কেমন ছিল তা সুস্পষ্ট জানা না থাকায় এই ধারাকেই অনুসরণ করে পরবর্তী কালে যাত্রার উদ্ভব হয়েছিল কিনা স্পষ্ট করে বলা যায় না। যদিও কোন কোন পণ্ডিতের মতে পাঁচালীর বৈচিত্র্য ও বিস্তৃতির সূত্র ধরে কালক্রমে যাত্রা-গানের উদ্ভব হয়েছিল।[২১] কিন্তু ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর দীর্ঘ আলোচনা দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, পাঁচালী থেকে যাত্রার উদ্ভব বস্তুতঃ অসম্ভব।[২২] পাঁচালী গানের বিভিন্ন আঙ্গিকের উল্লেখ করে মন্মথমোহন বসু পাঁচালীর ভাবকালি থেকেই যাত্রা-সংলাপের সৃষ্টি বলে[২৩] অনুমান করেছেন। কিন্তু তাঁর এই অভিমতও অনেকের মতে যুক্তিগ্রাহ্য নয়।[২৪] বস্তুতঃ, উনিশ শতকে দাশরথি রায় প্রমুখ প্রবর্তিত যে পাঁচালীর পরিচয় পাই তার সঙ্গে প্রাচীন পাঁচালীর কোন যোগ ছিল বলে মনে হয় না। পাঁচালীর উদ্ভব যেমন কীর্তন গান থেকে তেমনি "এর উপর 'নতুন যাত্রার' প্রভাব সক্রিয়" হয়ে উঠেছিল। সুতরাং দাশরথি বা তাঁর পূর্বসূরীদের অনুসৃত কীর্তনাঙ্গের পাঁচালীর প্রাচীনতা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ বর্তমান। কিন্তু যাত্রার প্রাচীনতা সন্দেহাতীত। বিভিন্ন ধর্মোৎসবকে উপলক্ষ করে যে নৃত্য-গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় তারই পরিণতি হিসেবে যাত্রার উদ্ভব সম্ভব হয়েছিল। ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল থেকেই লোকজীবনে নাট্যরস পিপাসা তৃপ্ত করতে গীতাভিনয় অনুষ্ঠানের কথা জানা যায়।[২৫]

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের আগেই এদেশে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক কাহিনী জনচিত্তকে আকৃষ্ট করেছিল সন্দেহ নেই কিন্তু আলোচ্য যুগে শাক্তধর্মও যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল।[২৬] সুতরাং এই শাক্ত ধর্মকে অবলম্বন করে তজ্জাতীয় শক্তি যাত্রাসমূহের অস্তিত্বও অসম্ভব নয়।[২৭] উনিশ শতকে প্রচলিত বেহুলা-লখিন্দর অবলম্বনে মনসার ভাসান যাত্রা হয়ত পূর্বোক্ত ধারারই অনুসরণ। কিন্তু মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর থেকেই যখন বৈষ্ণবধর্মে এক অভিনব ভাব-প্লাবন দেখা দেয়[২৮] তখন থেকেই কৃষ্ণযাত্রা এদেশের সর্বত্র প্রাধান্য লাভ করতে থাকে।[২৯]

চৈতন্যদেবের আবির্ভাব বাংলাদেশে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। সমাজ জীবনের সর্বস্তরে একটা নতুন ভাবের জোয়ার দেখা দিয়েছিল। একে অনেকে চৈতন্য রেনেশাঁ বলেও অভিহিত করেছেন। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও চৈতন্যদেবের দিব্যজীবনের সুগভীর প্রভাব পড়েছিল। সাহিত্য-শিল্পের কয়েকটি নতুন ধারার জন্ম হল তখন থেকেই। নাট্যচিন্তার ক্ষেত্রেও যে একটা নবতর উন্মেষ সম্ভাবিত হয়েছিল তার প্রমাণ লক্ষ্য করেছি শ্রীরূপের নাট্যরচনাপ্রয়াসে। এমনকি আনুষ্ঠানিক ভক্তমণ্ডলীর বাইরেও কেউ কেউ নাটক রচনার চেষ্টা করেছেন, তার উল্লেখ পাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বঙ্গদেশীয় বিপ্রের উল্লেখে। তবুও বলতে হয়, যেহেতু এ-সবগুলিই ছিল সংস্কৃত ভাষায় সংস্কৃত নাট্যরীতির অনুসারী তাই দেশীয় নাট্যকলায় এদের প্রভাব তেমন পড়েনি। বাংলাদেশের লোকাভিনয়ের ধারাটিও যে ক্রমোন্নতিতে পিছিয়ে ছিল, এমন মনে হয় না। চৈতন্যযুগে নাটক-লক্ষণ যে আরও পরিণত হয়ে উঠেছিল, তার প্রমাণ পাই মহাপ্রভুর সপার্ষদ কৃষ্ণ-লীলা অভিনয়ের মাধ্যমে। মহাপ্রভুর এই অভিনয়ের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন 'শ্রীচৈতন্যভাগবত', 'চৈতন্যমঙ্গল'ও 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়'। চৈতন্যদেব অভিনীত 'দানলীলা' চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁর এই অভিনয়টিকে কোন কোন সমালোচক 'যাত্রা'-ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছেন। কিন্তু চৈতন্যদেব যাত্রাভিনয় করেছিলেন কি না বলা যায় না কেননা, বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যের জবানীতে একে 'অঙ্কের বিধানে নৃত্য' বলেই উল্লেখ করেছেন। এই অভিনয়ে বিভিন্ন চরিত্রে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা সকলেই উপযুক্ত বেশবাসে সজ্জিত হয়েছিলেন। চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে 'চান্দোয়া কাটিয়া কাচ সজ্জ করা' হয়েছিল বলে উল্লিখিত আছে। এই অভিনয়ে স্বয়ং মহাপ্রভু লক্ষ্মীর অভিনয় করেছিলেন। তা ছাড়া নিত্যানন্দ-বড়াই, হরিদাস-কোতোয়াল, শ্রীবাস-নারদ, গদাধর—"গদাধর করিবেন রুক্মিণীর কাচ" ইত্যাদি বিভিন্ন চরিত্রে এক এক জন অভিনয় করেন। অভিনেয় চরিত্রের সঙ্গে অভিনেতাগণ একাত্ম হতে পেরেছিলেন। কিন্তু এই অভিনয় অনুষ্ঠানটি যাত্রা অথবা সংস্কৃত নাট্যরীতি অনুযায়ী অভিনীত হয়েছিল তার কোন সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই। 'অঙ্কের বিধানে নৃত্য' কথাটি দ্বারা কোন কিছুই স্পষ্ট বোঝা যায় না। তাছাড়া অভিনয়টির জন্য আগে থেকে কোন প্রস্তুতিও নেওয়া হয়নি—তাৎক্ষণিক রীতিতেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল।[৩০] সুতরাং ঘটনার বিবরণ অনুসারে মনে হয় অভিনয়টি সংস্কৃত নাট্যরীতিকে নয়, লোকাভিনয়ের ধারাকেই অনুসরণ করে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

বস্তুতঃ, কৃষ্ণলীলার জীবন্ত বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন ও তার প্রেমধর্ম বাংলার জনজীবনে সুদূর প্রসারী এবং স্থায়ী ছাপ ফেলেছিল। এ সময় থেকেই চৈতন্যদেবের জীবন অবলম্বনে 'নিমাই সন্ন্যাস' বা কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক 'কৃষ্ণযাত্রা'সমূহের সূত্রপাত। কিন্তু

এ-যুগে রচিত বা অভিনীত কোন নাটকের নিদর্শন আমাদের কালে এসে পৌছুয়নি। বরং সমকালীন পদাবলী সাহিত্যের মধ্যেই নাট্যলক্ষণটি অধিকতর সুপরিস্ফুট হয়েছিল। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার বিভিন্ন পর্যায় অবলম্বনে পালাকীর্তনের আসরে কীর্তনীয়াগণের 'আখরের' সাহায্যে অন্তর্নিহিত বিবিধ ভাব ও সংঘাতের পরিস্ফুটন নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করত। কোন কোন সমালোচক এই আখরের সম্প্রসারণ ও গায়কের তত্ত্বব্যাখ্যা ও মন্তব্যের সংযোজনা সহযোগে পালাকীর্তন গান থেকেই যাত্রার উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করেন। কিন্তু বিশেষ কোন একটি রীতির পরিণতিরূপেই যে যাত্রা বিকশিত হয়েছিল, এমন মনে হয় না।

বিভিন্ন মঙ্গল কাব্যে ও পাঁচালী কাব্যগুলির মধ্যে নাটক-লক্ষণ বিদ্যমান ছিল তা আমরা লক্ষ্য করেছি। তেমনি কথকতা বা পালাকীর্তনের ক্ষেত্রে কথক ঠাকুর বা কীর্তনীয়াগণের পরিবেশননৈপুণ্যে আসরে একটা নাটকীয় ভাব স্পষ্ট হয়ে উঠত সন্দেহ নেই। এ-প্রসঙ্গে সপ্তদশ শতাব্দীতে বিবিধ রোমান্টিক ঘটনা ও প্রেমকাহিনী নিয়ে হিন্দু মুসলমান কবিগণের রচিত গীতিকাব্য ও পালা গানগুলিকে স্মরণ করা যেতে পারে। এ সমস্ত পালা গানে নাটক-লক্ষণ যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় তা যেকোন অনুসন্ধিৎসু পাঠকই স্বীকার করবেন। সপ্তদশ শতাব্দীর আরাকান রাজসভার কবি দৌলত কাজির 'লোরচন্দ্রানী' ও 'সতী ময়না' বা আলাওলের 'পদ্মাবতী' ছাড়াও পূর্ববঙ্গের অনেক মুসলমান কবি অজস্র পালাগান রচনা করেছিলেন। যেমন 'মাণিকতারা', 'মাঞ্জুর মা', 'কাফন চোরা বা মনসুর ডাকাত', 'ভেলুয়া', 'নিজাম ডাকাত', 'দেওয়ান ফিরোজ শাহ', 'আয়না বিবি', 'নূরন্নেহা', 'দেওয়ানা মদিনা', 'সোনাবিবি' ইত্যাদি। এসব পালা-গানগুলিতে যে প্রথম শ্রেণীর নাটকীয় উপাদান ছিল তা অনেকেই লক্ষ্য করেছেন। এই পালাগুলি সম্পর্কে মন্মথমোহন বসুর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—

> "চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং বিচিত্র ঘটনাবলীর ঘাত-প্রতিঘাতে চরিত্রের বিকাশ ও হৃদ্‌গত প্রগাঢ়ভাবের স্ফুরণ প্রভৃতি যদি শ্রেষ্ঠ নাটকের লক্ষণ হয়, তাহা হইলে এই সকল পল্লীগাথা যে প্রথমশ্রেণীর নাটকের উপাদানে পূর্ণ, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।.....বলিতে কি, আমার মনে হয়, সেই সময়ের কোন প্রতিভাবান নাট্যকার যদি এই সকল উপাদান লইয়া নাটক রচনায় মনোনিবেশ করিতেন, তাহা হইলে হয়ত সেকালে আমাদের মধ্যেও একজন শেক্সপীয়রের আবির্ভাব দেখিতে পাইতাম।"[৩১]

উক্ত পালাগুলির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এগুলি দেবমাহাত্ম্যকে উপেক্ষা করে মানবিক প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা, আনন্দ-বেদনাকেই আশ্রয় করে রচিত। প্রথাসিদ্ধ

দেবলীলা বা দেবমাহাত্ম্য-সূচক কাব্যগুলির চাইতে মানবিক গুণবিশিষ্ট এই লৌকিক পালাগুলিতে নাটকীয় লক্ষণ বেশী পরিস্ফুট হয়েছিল। মাণিকচন্দ্র ও ময়নামতী ও তাঁদের পুত্র গোপীচন্দ্রকে অবলম্বন করে যে গানগুলি রচিত হয়েছিল তাতেও দেবমহিমা অপেক্ষা মানব-মহিমাই প্রাধান্য লাভ করেছিল। চেষ্টা ও সাধনার বলে যে মানুষ অসীম শক্তির অধিকারী হতে পারে, তাই পালাগুলির বর্ণিতব্য বিষয়। গোপীচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে যেমন পালাগান রচিত হয়েছে তেমনি এই কাহিনীগুলি নিয়ে নাটকও রচিত হয়েছিল। নেপাল থেকে সংগৃহীত নাটকগুলির মধ্যে 'গোপীচন্দ্র' নাটকখানি উক্ত ধারণার সত্যতা প্রমাণ করে। সপ্তদশ শতাব্দীতেই সম্ভবতঃ এই নাটকগুলি রচিত হয়ে থাকবে।

আগেই লক্ষ্য করেছি, বাঙালীর ভাবজীবনে প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব কত সুগভীর হয়েছিল। মহাপ্রভুর সময় থেকেই গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের অভ্যুদয়।[৩২] 'রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ' শ্রীগৌরাঙ্গ কৃষ্ণলীলার মূর্তিমান বিগ্রহ। চন্দ্রশেখর আচার্যরত্নের গৃহে মহাপ্রভুর কৃষ্ণলীলার অভিনয় এবং পরবর্তী কালে নীলাচলে থাকাকালীন দিব্যোন্মাদ অবস্থায় কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন পর্যায়ের ভাবের স্ফুরণ প্রভৃতি যেমন ভক্ত-বৈষ্ণব সমাজকে মুগ্ধ করেছিল তেমনি অপ্রাকৃত ভাববৃন্দাবনে রাধা-কৃষ্ণের অলৌকিক প্রেমলীলার এমন প্রাণবন্ত ও প্রত্যক্ষ প্রকাশ সকল শ্রেণীর মনেই এক বিস্ময় ও আনন্দের সঞ্চার করেছিল। যমুনাপুলিনে শ্যামের বংশীধ্বনি যেন অতি স্পষ্ট সুরে তখন সাধারণ বাঙালীর ঘরের পাশেই বেজে উঠেছিল। কৃষ্ণলীলাকে আশ্রয় করে পদরচনা বা নাট গীত জাতীয় গীতিকাব্য রচনার প্রয়াস মহাপ্রভুর আবির্ভাবের আগেও ছিল কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর কৃষ্ণযাত্রার প্রসার দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে থাকে। সঙ্গীত রসপিপাসু ও ধর্মপ্রাণ বাঙালী জনসাধারণ সঙ্গীতময় ও ভক্তিরসাত্মক এই কৃষ্ণযাত্রার মধ্যেই চিত্তমুক্তির সন্ধান পেয়েছিল। বাংলার জাতীয় জীবনের চিত্ত-ভাবনার পরিপোষক এই সঙ্গীত ও ভক্তিরসের প্রাধান্য এ-যুগের নাটক ও সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, সঙ্গীতবহুলতা ও ভক্তিরস প্রাবল্য যথার্থ নাটক সৃষ্টির পরিপন্থী। আর এই কারণেই, বৈষ্ণবীয় ভক্তিভাব ও সঙ্গীতবহুল কৃষ্ণযাত্রা সার্থক নাটকের ক্রমপরিণতি লাভ করতে পারেনি।[৩৩] কৃষ্ণযাত্রাসমূহের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল,

ক) সুনির্দিষ্ট ও সুগ্রথিত কাহিনীর অভাব। নাটকে যেহেতু রসই ছিল মুখ্য আস্বাদ্য তাই স্বল্প-কাহিনী অবলম্বন করে সঙ্গীতের পর সঙ্গীত যোজনা করে কাহিনী পরিণতির দিকে এগিয়ে যেত।

খ) কাহিনীর বৈচিত্র্যের অভাব থাকায় নাটকীয় কৌতূহল সৃষ্টি করতে পারত না।

গ) অতিরিক্ত সঙ্গীত-বাহুল্যে নাটকের গতি হয়ে পড়ত শ্লথ মন্থর।

উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, নাটকীয় উপাদান সৃষ্টিতে কৃষ্ণযাত্রা ততটা সহায়ক হতে পারেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও সঙ্গীতরসলিপ্সু, ভক্তপ্রাণ বাঙালী এই ভক্তিরসাত্মক সঙ্গীতবহুল কৃষ্ণযাত্রার মাধ্যমেই তাদের রস-পিপাসা চরিতার্থ করত। "দশাবতারের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণলীলা—প্রসঙ্গই সাধারণ হিন্দু মাত্রের আদরের জিনিস। এই কারণে হিন্দু মাত্রেরই কৃষ্ণলীলা ব্যাপার সাধারণের চিত্তে দৃঢ়াঙ্কিত রাখিবার জন্য সেই লীলাময়ের অপূর্ব চরিত্রের এক একটি অংশমাত্র প্রদর্শন করিয়া এক একটি উৎসবের প্রবর্তন করিয়া আসিতেছেন।"[৩৪] আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি যে, চৈতন্য-সমকালে শাক্ত বা শৈব-প্রভাব পুষ্ট শক্তি-যাত্রা বা শিব-যাত্রা এমনকি রামযাত্রারও বিদ্যমানতা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর অন্যান্য 'যাত্রা' অপেক্ষা কৃষ্ণযাত্রাই যে সমধিক প্রাধান্য লাভ করেছিল, একথা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ষোড়শ শতকে চৈতন্যদেব কর্তৃক কৃষ্ণলীলার অভিনয় বিবরণ ছাড়া উনিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা নাট্যসাহিত্যের কোন নিদর্শন আমাদের হাতে এসে পৌঁছুয়নি। উনিশ শতকের প্রাক্কালে অথবা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে নব সংস্কৃত কৃষ্ণ-যাত্রার প্রবর্তক শিশুরাম অধিকারী। এজন্য কোন কোন সমালোচক আধুনিক যাত্রা-গানের আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টীয় উনিশ শতকের প্রথমভাগ বলেই অভিমত প্রকাশ করেছেন। অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তীর মতে, "যাত্রা অভিনয় প্রসঙ্গে দুটি শতাব্দীর কথা আমাদের মনে রাখতে হবে—ষোড়শ আর ঊনবিংশ। যাত্রার বীজ পত্তন হয়েছিল ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গলার মাটিতে অংকুর দেখা গেল ঊনবিংশ শতকে"[৩৫]। অধ্যাপক চক্রবর্তীর এই অভিমত সর্বথা গ্রহণযোগ্য নয়। যাত্রার বীজ পত্তন ষোড়শ শতাব্দীর আগেই সম্ভব হয়েছিল পূর্ববর্তী আলোচনাতেই আমরা তা লক্ষ্য করেছি।

চৈতন্যদেবের পর কৃষ্ণ-যাত্রা 'কালীয়দমন' এই সাধারণ নামেই অভিহিত হতে থাকে। কৃষ্ণ-যাত্রা যে কেন বিশেষ করে 'কালীয়দমন' এই সাধারণ নামে খ্যাত হল তার কারণ স্পষ্ট করে কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে মনে হয়, কালীয়-হ্রদে কালীয় নাগকে যে শ্রীকৃষ্ণ নির্জিত করেছিলেন, সেই বহুখ্যাত ঘটনা অবলম্বনে সে সময় কোন কোন নাটক বা যাত্রা অভিনীত হয়ে থাকবে।[৩৬] আর তখন থেকেই কৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক সকল যাত্রাই 'কালীয়দমন' এই সাধারণ খ্যাতি লাভ করেছিল। কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের "চণ্ডীমঙ্গলের' ধনপতির উপাখ্যানে ইন্দ্রপুত্র মালাধরের কালীয়দমন অভিনয়ের বিবরণ সমকালীন প্রচলিত তজ্জাতীয় যাত্রার দৃষ্টান্ত প্রসূত বলেই মনে হয়। তবে কৃষ্ণ-যাত্রা বলতে সাধারণভাবে 'কালীয়দমন'কে বুঝালেও এই যাত্রা শুধু ঐ লীলাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না; শ্রীকৃষ্ণ-লীলার

অন্যান্য প্রসঙ্গ, যেমন—দান, মান, মাথুর প্রভৃতিও এই 'কালীয়দমন' নামেই অভিনীত হত।

সুতরাং বৈষ্ণব ধর্ম প্রভাবিত-যাত্রাই এ-সময়ে যেমন প্রাধান্য লাভ করেছিল তেমনি দীর্ঘ দু'তিন শতাব্দী জুড়ে এই কৃষ্ণ-যাত্রাই অন্য ধারার যাত্রার প্রভাবকে স্তিমিত করে বাংলা যাত্রা-নাট্য-জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছিল। অতএব কৃষ্ণ-লীলাকেই এ-যুগের যাত্রার কেন্দ্র-বিন্দু ধরা যেতে পারে কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে কবি-গানের প্রভাবে এই কৃষ্ণ-যাত্রায় নিম্নরুচির অনুপ্রবেশ একে অশ্লীলতাপূর্ণ চিত্তবিনোদন অনুষ্ঠানে পর্যবসিত করে ফেলতে থাকে। যাত্রা-গানের এই রুচিবিকৃতির দরুণ ভদ্র-মার্জিত রুচির লোকের কাছে তা একেবারে ধিক্কারের বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। যাত্রা-গানের এই অধঃপতন লক্ষ্য করে সমাচার দর্পণ একদা মন্তব্য প্রকাশ করেছিল—

> "স্ত্রীলোকের অকর্তব্য এই ২ দুষ্ট বুদ্ধিতে অন্যপুরুষ অবলোকন ও সহবাস ও যাত্রোৎসবে গমন ও একাকিনী গমন ও ব্যভিচারিণীর সংসর্গ। এই সকল কর্ম্ম স্ত্রীলোকের ধর্ম্মনাশের কারণ হয়।"—১৩ই এপ্রিল, ১৮২২।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কৃষ্ণলীলার সঙ্গে কীর্তন, মঙ্গলগান ঝুমুরের আঙ্গিক মিশিয়ে নাটকের ধরণে নবসংস্কৃত কালীয়দমন যাত্রার উদ্ভব হয়।[৩৭] বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্ব গ্রামের শিশুরাম অধিকারী এই কালীয়দমন যাত্রার প্রবর্তক বলে খ্যাত। এ-প্রসঙ্গে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অভিমত উদ্ধৃত করলে উল্লিখিত সমাচার দর্পণের মন্তব্যের যাথার্থ্য অনুধাবন করতে পারব। "...গত বিংশতি বৎসরের মধ্যে কবির হ্রাস হইয়াছে। তাহার ত্রিংশৎ বৎসর পূর্ব হইতে যাত্রা বিশেষ প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল। শিশুরাম অধিকারী নামা এক ব্যক্তি কেঁদুলী গ্রাম নিবাসী ব্রাহ্মণ তাহার গৌরব সম্পাদন করে। তৎপূর্ব হইতে বহুকালাবধি নাটকের জঘন্য অপভ্রংশ স্বরূপ একপ্রকার যাত্রা এতদ্দেশে বিদিত আছে। সংকীর্তন ও পরে কবির প্রচারের মধ্যে তাহার প্রায় লোপ হইয়াছিল। শিশুরাম হইতে তাহার পুনর্বিকাশ হয়।"[৩৮] শিশুরামের শিষ্য পরমানন্দ অধিকারী। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে তিনি বর্তমান ছিলেন। পরমানন্দের বাসস্থান বীরভূম জেলারই রামবাটী গ্রামে। কৃষ্ণ-যাত্রার একঘেয়েমির মধ্যে কিছু বৈচিত্র্য সম্পাদন করে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন। যাত্রার সঙ্গীত বাহুল্যের স্থলে গদ্য সংলাপের ব্যবহার ও ঘটনা বৈচিত্র্য সম্পাদন করে যাত্রায় নাটকীয় গতিবেগ সৃষ্টি করবার প্রাথমিক কৃতিত্ব পরমানন্দেরই প্রাপ্য। পরমানন্দই সর্বপ্রথম যাত্রা গানে 'তুক্কো' প্রথা প্রবর্তন করেন। পরমানন্দের কৃতিত্ব প্রসঙ্গে হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য—"There was not too much abundance of songs in Parama's yatra. For producing

poetic effect Parama used dialogues in greater proportion and songs were composed in prayers (or rhymed couplets) and they were often sung in the tune with which prayers were used to be sung. At the last end of the rhymed couplets he used to sing in the tune of Kirtan ...That was known as Tukko and Paramananda was its creator."[৩৯] একথায় পরমানন্দ পূর্বতন যাত্রায় সর্বাংশে না হলেও কিছু নতুনত্ব আনয়ন করতে পেরেছিলেন। তাঁর কৃতিত্ব একেবারে ত্রুটিহীন নয়। তাঁর যাত্রায় নাটকীয়তা ও সংলাপ আছে, একথা সত্য "although song, melodrama and Baisnab themes were not altogether discarded." পরমানন্দের পর শ্রীদাম সুবল কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক যাত্রা রচনা করে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। জিরেট নিবাসী কৃষ্ণ-প্রেমিক বদন অধিকারী দান মান মাথুর বিষয় অবলম্বন করে যাত্রার পালা রচনা করে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। বদনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই প্রকৃতপক্ষে পুরনোরীতির কালীয়দমন যাত্রার বিলোপ ঘটেছিল। দান মান মাথুর প্রভৃতি চিরাচরিত রীতির পরিবর্তে অধিকতর মানবীয় গুণসম্পন্ন 'নিমাই সন্ন্যাস' ও 'অক্রুর সংবাদ' পালা রচনা করে লোচন অধিকারী বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পেরেছিলেন।

॥ ৩ ॥

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই যাত্রাপালায় রস ও রুচির দিক থেকে একটা পরিবর্তন বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। গোবিন্দ অধিকারী এ-যুগের প্রসিদ্ধ যাত্রাকার। বাংলাদেশের তৎসমসাময়িক জনরুচির সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে গোবিন্দ অধিকারী যাত্রা পালায় নব্যরীতির প্রবর্তন করেন।[৪০]

গোবিন্দ অধিকারী প্রথম 'নৌকা বিলাস' পালা রচনা করে জনচিত্ত জয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই পালায় গোবিন্দ স্বয়ং দূতীর ভূমিকায় অভিনয় করতেন। গোবিন্দ অধিকারী ছাড়াও কৃষ্ণ-যাত্রায় দূতীর ভূমিকায় অভিনয় করে বদন অধিকারী এবং নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় খ্যাতি লাভ করেছিলেন। সমকালীন প্রসিদ্ধ কৃষ্ণযাত্রাকারগণের মধ্যে কাটোয়ার পীতাম্বর অধিকারী, শ্রীরামপুরের রাধাকৃষ্ণ দাস, বিক্রমপুরের কালাচাঁদ পাল এবং নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় 'কংসবধ', 'চণ্ডালিনী উদ্ধার', 'যযাতির যজ্ঞ' প্রভৃতি পালা রচনা করেছিলেন।

দীর্ঘকাল যাবৎ কৃষ্ণ-যাত্রাই বাঙালীর নাট্যরস ও ভক্তিরসপিপাসার পোষকতা করে এসেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই ধারাটির পুনরুজ্জীবন ঘটে কৃষ্ণকমল গোস্বামীর হাতে।

তিনি যাত্রা পালাকে শুদ্ধ ও পরিশীলিত রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। অশ্লীলতা ও দূষিত রুচির হাত থেকে উদ্ধার করে কৃষ্ণ-যাত্রাকে বিশুদ্ধ ভক্তিরসে অভিষিক্ত করবার প্রসংশনীয় উদ্যম তাঁকে এ-যুগের যাত্রাকারগণের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী করেছে। এ-যুগের যাত্রা পালায় অমার্জিত অঙ্গ-ভঙ্গী, ভাঁড়ামি ও কদর্য বেশবিন্যাস সম্পর্কে তাঁর বিরূপ মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে 'বিচিত্র বিলাসে'র ভূমিকায়। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন, "যদিও প্রচলিত অভিনয় (যাত্রা) অনায়াস দৃশ্য, কিন্তু তাহা সহৃদয় ব্যক্তিগণের নিতান্ত বিরক্তিকর, কারণ অনভিজ্ঞ অভিনেতৃবর্গ সামান্য লোকের প্রীতিপ্রদ রহস্য সাধনের উদ্দেশ্যে প্রবন্ধগত প্রকৃতভাব পরিত্যাগপূর্বক অসাময়িক অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ, নানাপ্রকার কদর্য অঙ্গ-ভঙ্গী ও নিতান্ত অবিধেয় বেশবিন্যাস করিয়া থাকে।" ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণকমল 'নিমাই সন্ন্যাস' পালা রচনা করেন। তাঁর 'স্বপ্নবিলাস', 'বিচিত্র বিলাস', 'রাই উন্মাদিনী', 'ভরত মিলন', 'নন্দবিদায়', 'সুবল মিলন', 'গন্ধর্বমিলন' প্রভৃতি পালা গান জনপ্রিয় হয়েছিল। কৃষ্ণকমলের পালাগুলি পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা পূর্ববঙ্গের যাত্রাগানের উপরই অধিকতর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

উদ্ভব যুগে ধর্মমূলক বিষয়বস্তুই যাত্রাগানের প্রধানতম ও একমাত্র অবলম্বন ছিল। বাঙালীর ধর্মপ্রাণতাই সম্ভবতঃ এর মূল কারণ। আলোচনা সূত্রে আমরা আরও লক্ষ্য করেছি যে, এ-যুগের যাত্রার প্রধানতম উপজীব্য ছিল কৃষ্ণলীলা সম্পর্কিত বিষয়বস্তু। মনে হয়, এজন্যই বাংলাদেশে 'কানু ছাড়া গীত নাই' এমন একটি প্রবাদ সৃষ্টি হয়ে থাকবে। কিন্তু কালক্রমে 'কৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ' ছাড়া অন্যান্য বিষয় অবলম্বন করেও যাত্রার পালা তৈরী হয়েছিল। রামায়ণ, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি কাহিনী অবলম্বনে পরবর্তী কালে 'রামযাত্রা', 'চণ্ডীযাত্রা' এবং ভাসান যাত্রাগুলির উদ্ভব হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, বাঁকুড়ার আনন্দ ও জয়চন্দ্র অধিকারীর 'রামযাত্রা', ফরাসডাঙ্গার গুরুপ্রসাদ বল্লভের 'চণ্ডীযাত্রা' এবং লাউসেন বড়ালের 'মনসার ভাসান'। ৫০-৬০ বৎসরের আগে পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে 'মনসার ভাসানে'র জনপ্রিয়তা এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বলে মনে করি। পাতাই হাটের প্রেমচাঁদ অধিকারী 'মহীরাবণবধ' যাত্রা পালা রচনা করে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। উল্লিখিত লব্ধ প্রতিষ্ঠ যাত্রাকার বা তাঁদের পরিচালিত দলগুলি ছাড়া অনেক অখ্যাত যাত্রাদল ছিল। এদের সম্পর্কে এখন আর কোন বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। আলোচ্য যুগের যাত্রাভিনয়ের সাজ-সজ্জা ও গীতবাদ্য এবং নাটকের উপস্থাপনা বিষয়ে নগেন্দ্রনাথ বসু অতি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন।

"তখন কাঁচা পাট ঝুলাইয়া মুনিগোঁসাই-এর দাড়ি ও শিকার মত বিনান পাটের

দড়ি মাথার জটা হইত। অনেক স্ত্রীবেশধারী সখী ও নটীদিগের দাড়ি ও গোঁফের রেখা দেখা যাইত। এই সকল হাস্যোদ্দীপক চিত্র সম্মুখে উপস্থিত থাকিলেও তৎকালে এক গাওনার জোরেই যাত্রা সাধারণের চিত্তাকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ধর্মরস, কাব্যরস, সঙ্গীতরস এবং নাট্যরস অনুভব করাইয়া অভিনয় কার্য সম্পাদন করিলে যথার্থই দর্শক ও শ্রোতাদিগের নয়ন ও মন আকৃষ্ট হইয়া থাকে। বেশ পারিপাট্যে ততদূর হয় না; যাত্রায় সংগীত ও বাদ্যাদি কার্য প্রকৃতরূপ তাল, লয় ও তান মানসহকারে সম্পাদিত হইলে প্রকৃতই শ্রোতার চিত্ত তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

"বাঙ্গালার আদি কালীয়দমন যাত্রায় দান, মান, মাথুর, অক্রুর সংবাদ, উদ্ধবসংবাদ, সুবলসংবাদ প্রভৃতি পালা অভিনীত হইত। উহাতে খোল, করতাল ও বেহালা এবং কতকগুলি সামান্য রকমের সাজগোজই উপকরণ ছিল। সাজের মধ্যে কৃষ্ণের পীতধরা ও চূড়া এবং যশোমতী, বৃন্দাদি সখী ও গোপবালকগণের পরিধেয় একটি রঙ্গিন্ কাপড়ের ঘেরাটোপ (কতকটা চোগার মত), তাহার সম্মুখের দুইপার্শ্বে পেশওয়াজের ন্যায় জরির পাড় বসান থাকিত। তখনকার কৃষ্ণযাত্রায় গৌরচন্দ্রী পাঠের পর কৃষ্ণের নৃত্য ও তদন্তে মুনি গোঁসাইয়ের শুভাগমন হইত।"[৪১]

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকেই কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সখের যাত্রাদল গঠিত হতে থাকে। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে বরাহনগর নিবাসী ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় সখের বিদ্যাসুন্দর যাত্রাদলের প্রতিষ্ঠা করেন। এর প্রায় ১০ বছর আগেই বউবাজারের কতিপয় ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সখের বিদ্যাসুন্দর যাত্রা অভিনয় করেছিলেন। যদিও এঁদের যাত্রা দল ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের দলের মত প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি। ঠাকুরদাসের দলের সাফল্যে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয়ে দক্ষিণ বরাহনগরে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সৃষ্টি হয়। এঁদের অভিনীত বিদ্যাসুন্দর যাত্রাও বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এর পর একের পর এক সখের যাত্রাদল সৃষ্টি হতে থাকে। অধিকাংশ যাত্রাদলই প্রধানত বিদ্যাসুন্দর পালারই অভিনয় করত। বরাহনগরের সখের যাত্রাদলের সমকালেই ভবানীপুরের বেলতলায় শিবুঠাকুরের ও প্যারীমোহনের যাত্রার দলের কথা জানা যায়। প্যারীমোহনের দল দক্ষতার সঙ্গে বিদ্যাসুন্দর পালা অভিনয় করে। প্যারীমোহনের বিদ্যাসুন্দর যাত্রা তখন কলকাতায় এতটা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে, অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই এই জাতীয় যাত্রায় অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলেন!

প্যারীমোহনের যাত্রার দ্বারা বিশেষভাবে যাঁরা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে শ্যামবাজারের নবীন বসুর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি বহু লক্ষ টাকা ব্যয় করে কলকাতার গণ্যমান্য ও গুণীলোকদের নিয়ে একটি দলগঠন করেন। এই যাত্রায় যদিও দোয়ার ছিল

2 MAR 1982 77728

না তবুও একে ঠিক থিয়েটারী অভিনয়ও বলা যাবে না কেননা নবীন বসুর বিদ্যাসুন্দরের অভিনয় প্রাচীন যাত্রার অনুকরণেই সম্পাদিত হয়েছিল। তবে এই অভিনয়টি বাংলা অভিনয়ের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ; নবীন বসু তাঁর এই নাটকে স্ত্রীচরিত্রগুলি স্ত্রীলোকদের দ্বারাই অভিনয় করিয়েছিলেন।

এসময় কলকাতার একটি মেয়ে যাত্রার দলও ছিল।[৪২] তাছাড়া মধুসূদন ভট্টাচার্য গোপালচন্দ্র দাস উড়ে, কলকাতার হাড়কাটা-গলি নিবাসী স্বরূপ দত্ত, গোপাল উড়ের প্রতিযোগী উত্তর-আড়িয়াদহ নিবাসী ঠাকুরো যুগী ও শিবে যুগী, গোবিন্দ যোগী, শ্রীরামপুরের কৈলাসচন্দ্র বারুই প্রভৃতির যাত্রাদল বিদ্যাসুন্দর যাত্রাপালা অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করেছিল। এঁদের ছাড়াও অনেক খ্যাত ও অখ্যাত যাত্রাকার ও তাঁদের দল যাত্রাভিনয় করেছেন। কিন্তু এইসব যাত্রা কালক্রমে থিয়েটারের প্রভাবে নানাভাবে প্রভাবিত হতে থাকে। ধীরে ধীরে যাত্রার অঙ্গ থেকে প্রাচীনতার পোষাক খসে গিয়ে আধুনিকতার ছাপ পড়ে এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে শক্তিশালী পালাকারদের হাতে যাত্রার নতুন নতুন ঘটনার সংযোজন ও বৈচিত্র্য সম্পাদিত হতে থাকে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকেই থিয়েটারের প্রতি শিক্ষিত বাঙালী বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং আধুনিক রীতির বাংলা নাটকের উন্মেষকে ত্বরান্বিত করে তোলে। কিন্তু সে-প্রসঙ্গ স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়। তার আগে উনিশ শতকের যাত্রার বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক কয়েকটি বিষয় আলোচনা করে নেওয়া যেতে পারে।

উনবিংশ শতাব্দীতে বিদ্যাসুন্দর পালাকে আশ্রয় করে সখের যাত্রাদল সৃষ্টি হওয়ার আগে পর্যন্ত যাত্রাজগতে কৃষ্ণ-লীলা সম্পর্কীত বিষয়গুলিরই বিশেষ প্রাধান্য ছিল, কখনও কখনও রামযাত্রা, চণ্ডীযাত্রা বা মনসার ভাষান যাত্রারও উল্লেখ পাওয়া যায় কিন্তু এসব যাত্রারই প্রধান অবলম্বন ছিল ধর্মভাব। উনবিংশ শতাব্দী থেকেই যাত্রায় দৈবনির্ভরতা ও ভক্তিরসপ্রাধান্য হ্রাস পেতে থাকে। এসময় থেকে যাত্রায় দেবমহিমা অপেক্ষা মানব মহিমাই প্রাধান্য লাভ করে। অবশ্য এই মানব লক্ষণ শুধু যাত্রার ক্ষেত্রেই নয় সাহিত্য শিল্পের সর্বক্ষেত্রেই নবমানবতাবাদের প্রতিষ্ঠার সূচনা এসময় থেকেই। একথা সত্য যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির স্পর্শে বাঙালীমনের মধ্যযুগীয় সংস্কার ও অভিজ্ঞতার অন্ধকার অপসারিত হয়েছিল। কিন্তু এর সূচনা হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই। ভারতচন্দ্রের মধ্যেই আমরা মানবমহিমা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস লক্ষ্য করি। মধ্যযুগীয় গতানুগতিকতায় ভারতচন্দ্র এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম। দেবতার সমুন্নত মহিমা মনুষ্যত্বের কাছে ম্লান হয়ে এল। ভারতচন্দ্রে যার সূচনা মধুসূদনে তার সার্থক প্রকাশ। মধ্যবর্তী একশ বছর যুগান্তরের কাল। ভাবজগতে এক আমূল পরিবর্তনের স্রোত বয়ে চলেছে তখন।

"সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেবত্ব এবং অলৌকিকতার মোহ একটু একটু করিয়া কাটাইয়া উঠিতে লাগিলাম, বহুদিনের আচ্ছন্নমন একটু একটু করিয়া হইতে লাগিল সংস্কারমুক্ত। দেবত্বের মোহ, অলৌকিকতার মায়াজাল কাটিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের চোখ পড়িতে লাগিল মানুষের দিকে, তাহার মহিমাই ক্রমে ক্রমে হৃদয় ও মন অধিকার করিতে লাগিল! এই মানবতার সুরই আধুনিক যুগের মূল সুর।"[৪৩]

সুতরাং যাত্রা জগতেও নবযুগের এই মানবতার লক্ষণ অপ্রকাশিত থাকল না। তাই সেদিন মানবীয় বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ 'বিদ্যাসুন্দর পালা'ই অধিকতর আকর্ষণীয় বলে মনে হয়েছিল। এসময় থেকেই 'বিদ্যাসুন্দর' ও 'নলদময়ন্তী'র কাহিনী অবলম্বনে 'নতুন যাত্রা'র উদ্ভব হয়। কিন্তু এই যাত্রায় জনরুচিকে তৃপ্ত করতে গিয়ে আনন্দবিধানের এমন কতকগুলি মাধ্যম অবলম্বন করেছিল যাতে যাত্রা রুচিবিকৃতি দোষে অতিশয় দুষ্ট হয়ে পড়ল।[৪৪] বিদ্যাসুন্দর যাত্রার আকর্ষণীয় বিষয় হল খেমটা নাচ। গোপাল উড়েই যাত্রায় খেমটা নাচের প্রবর্তক। তাঁর যাত্রার 'কেশেমালিনী'ই সম্ভবতঃ এই নৃত্যধারার পূর্বসূরী। এই নাচের তাল যাত্রার সমস্ত চরিত্রকেই মাতিয়ে তুলেছিল। রাম, সীতা, রাবণ, কৈকেয়ী, কৃষ্ণ-রাধা সকলেই নিজ নিজ নৃত্যভঙ্গিমায় দর্শকমণ্ডলীর তৃপ্তি সম্পাদনের প্রয়াস পেত। ছোট বড় সকল চরিত্রই নর্তক; লক্ষণীয় যে, পাত্রাপাত্র নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর চরিত্রের যথেচ্ছ নৃত্যচর্চা যে 'বীভৎস রসে'র[৪৫] সৃষ্টি করত, তা কিন্তু দর্শকদের কাছে অরুচিকর বা অপ্রীতিপ্রদ বলে মনে হত না বরং এই অশালীন অভিনয় চর্চার মাধ্যমে তারা এক বিজাতীয় অদ্ভুত রসকে আস্বাদন করত। বস্তুতঃ, অশ্লীল ও আদিরসাত্মক নৃত্যগীতাদি এ-যুগের যাত্রার প্রধান অঙ্গ ছিল। চুটকী জাতীয় আদিরসাত্মক সঙ্গীত শ্রোতৃমণ্ডলী পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গেই উপভোগ করত। উদাহরণ স্বরূপ দুটি চুটকী উদ্ধৃত করলে এ-যুগের পালাগুলির সঙ্গীতাংশের মান ও শ্রোতার চাহিদার স্বরূপ উপলব্ধি করা যাবে।

১. "কি শুনাব রূপের কথা, এক মুখে বা বলবো কত।
উন্মত্ত হয় পতিব্রতা, মন্মথ হয় অভিভূত॥
বদনে দিয়েছে দেখা, ঈষত গোঁফের রেখা;
ইথে কি কুল যায় গো রাধা, কুলবতীর কুল হতে॥

২. "সুন্দর পড়েছেন ধরা শুনেছ কি ও ঠাকুর ঝি।
সোনার অঙ্গে মারছে ছড়ি, হাতে দড়ি বাকি আর কি।
(আমরা) যে অঙ্গে মাখাতেম চন্দন, সেই অঙ্গে করেছে বন্ধন,
লাজে সে ভূপতি-নন্দন, প্রকাশে না কমল আঁখি।"

এ-যুগের অন্যতম প্রসিদ্ধ যাত্রা অধিকারী কৈলাসচন্দ্র বারুই। স্বভাব বর্ণনায় তাঁর বেশ দক্ষতা ছিল। হাল্কা ও আদিরসাত্মক গান ও নাটকীয় পাত্র-পাত্রীর অশালীন অঙ্গ-ভঙ্গী, অসংযত বাক্যবিন্যাস এ-যুগের অধিকাংশ যাত্রাগানের শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দবিধানের সহজ মাধ্যম ছিল।

বিদ্যাসুন্দর যাত্রার এই অশালীনতা ও রুচিবিকৃতি অন্যনিরপেক্ষ কোন ঘটনা নয়। আমরা জানি, সাহিত্যশিল্প সমাজ-মানসেরই প্রতিচ্ছবি। একটি যুগের চিন্তা-ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, রুচি-প্রকৃতি সে-যুগের সাহিত্যকে প্রভাবিত করবেই। এ-বিষয়ে নাটকের ভূমিকা বরং একটু বেশী। জনসাধারণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ নাটকের। তাই নাটক জাতীয় জীবনের দর্পণ বিশেষ। নাটকের মধ্যেই দেশ ও জাতির বিশিষ্ট মানসিকতাটি সহজেই ধরা পড়ে। আলোচ্য যুগের রুচির বিকার স্পর্শ করেছে এই যাত্রা পালাগুলিকে। অবশ্য এই রুচিবিকৃতি একদিনে ঘটেনি। ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর মধুসূদনের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত এই দীর্ঘ এক শতাব্দী বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাস অনুজ্জ্বল। উনিশ শতকের প্রথম দিকে এক ঈশ্বর গুপ্ত ছাড়া আর কোন কবি নেই। অবশ্য এ-যুগের রুচি বিকৃতির প্রভাব থেকে ঈশ্বর গুপ্তও রেহাই পাননি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধ ধরে যাঁরা বাংলার কাব্য সঙ্গীতের আসরকে সরগরম করে রেখেছিলেন, তাঁরা কবিওয়ালার দল। অশিক্ষিত পটুত্বের অধিকারী, অধিকাংশ কবিওয়ালাই তখন কবিগান, আখড়াই, হাফ আখড়াই, তর্জা, ঝুমুর ইত্যাদির মাধ্যমে হাল্কা ও চটুল রসের সঙ্গীত পরিবেশন করে কলকাতার গানের আসর তাতিয়ে ও মাতিয়ে রাখত। এ-যুগের রুচি বিকৃতির স্বরূপটি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অনবদ্য ভাষায় বর্ণনা করে বলেছেন, "সেকালে অশ্লীলতা ভিন্ন কথায় আমোদ ছিল না। যে ব্যঙ্গ অশ্লীল নহে, তাহা সরস বলিয়া গণ্য হইত না। যে গালি অশ্লীল নহে, তাহা কেহ গালি বলিয়া গণ্য করিত না। তখনকার সকল বাক্যই অশ্লীল। চোর কবি; চোর—পঞ্চাশৎ দুই পক্ষে অর্থ খাটাইয়া লিখিলেন—বিদ্যাপক্ষে এবং কালীপক্ষে—দুই পক্ষে সমান অশ্লীল। তখন পূজা-পার্বণ অশ্লীল, উৎসবগুলি অশ্লীল—দুর্গোৎসবের নবমীর রাত্রি বিখ্যাত ব্যাপার, যাত্রার সঙ্ অশ্লীল হইলেই লোকরঞ্জক হইত। পাঁচালী, হাফ-আকড়াই অশ্লীলতার জন্যইরচিত।"[৪৬]

সুতরাং সমাজ জীবনের সর্বস্তরে এই পাইকারী রুচিহীনতা ও অশ্লীলতার যুগে লোকরঞ্জক যাত্রাও এই রুচিবিকৃতিরই পরিপোষক হবে তাতে আশ্চর্য কি! কিন্তু এ-যুগের নবশিক্ষিত বাঙালী তরুণদের মধ্যে এই অশালীনতার প্রতি একটা তীব্র বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল। এসময়ে কলকাতায় 'অশালীনতা নিবারণী সভা' নামে একটি প্রতিষ্ঠানেরও সৃষ্টি হয়েছিল বলে জানা যায়। ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার আলোকপ্রাপ্ত পরিশীলিত

রুচির শিক্ষিত বাঙালীরা আর এই যাত্রায় তাঁদের মনের ক্ষুধা মেটানোর মত কোন উপাদান খুঁজে পেলো না। ইংরেজী নাটক ও ইংরেজী নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমেই তাঁরা তখন তাঁদের রসপিপাসা চরিতার্থ করবার চেষ্টা করেছেন। সমকালীন বিকৃত রুচির 'যাত্রা' সম্পর্কে শিক্ষিত বাঙালীর ধারণাটি রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মন্তব্যে স্পষ্ট হয়েছে। কবি ও খেউড়-এর প্রতি ঘৃণা ও আধুনিক নাট্যানুশীলনের প্রতি শ্রদ্ধা ও আগ্রহ নিয়ে তিনি বলেছেন—"খেউড় ও কবি যে কি-পর্যন্ত জঘন্য ছিল তাহা ভব্যতা রক্ষা করিয়া বর্ণন করাও দুষ্কর; যাঁহারা তাহাতে প্রণোদিত হন তাঁহাদিগের মনের অবস্থা অনুধ্যান করিতে হইলে সহৃদয়দিগের মনে যে প্রবল আক্ষেপের উদয় হয় সন্দেহ নাই।···দেশের কোন অত্যন্ত ধনী ও ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তির দৃষ্টান্তে অনেক মন্দ ব্যবহার প্রচলিত হইতে পারে; কিন্তু তাঁহার খ্যাতি হ্রাস হইলে ও জ্ঞানালোকের কিঞ্চিন্মাত্র ব্যাপ্তি হইলে অবশ্যই সে ব্যবহার দূষ্য বোধে পরিত্যক্ত হইয়া থাকে।···গত চারিবৎসরাবধি কলিকাতা-নগরে অনেক স্থানে প্রকৃত নাটকের অভিনয় সম্পন্ন হইতেছে। তদ্দর্শনে ধনী সম্ভ্রান্ত বিদ্যানুরাগী সকলেই একত্র হইয়া থাকেন; ও অভিনয়ের নির্মলরসে পরিতৃপ্ত হইতেছেন। এই সরস বিনোদে দেশ ব্যাপ্ত হয়—প্রতি গ্রামে উহার অনুরাগ হয়—ইহার প্রাদুর্ভাব যাত্রা কবি খেঁউড় প্রভৃতি দূষ্য উৎসবের দূরীকরণ ঘটে—ইহা কর্তৃক বঙ্গদেশে কুনীতির উৎসেদ ও নির্মল ব্যবহারের প্রাদুর্ভাব হয়—ইহাই আমাদের নিতান্ত বাঞ্ছনীয় এবং তদর্থে আমরা দেশহিতৈষিদিগকে একান্তচিত্তে অনুরোধ করিতেছি।"[৪৭]

—উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ হলেও এর মধ্যেই নবযুগের শিক্ষিত বাঙালীর পরিবর্তমান মানসিকতাটি অনুধাবন করা যাবে। এসময় থেকেই শিক্ষিত বাঙালী ইংরেজী ধরনের নাটক ও মঞ্চাভিনয়ের প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। এই নাট্যরস-পিপাসাই বাংলা নাটকের জন্মসম্ভাবনার যেমন পথ প্রস্তুত করে দিয়েছিল তেমনি বাংলা নাটকের সঙ্গে যাত্রার সম্পর্ককে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে দিল। বস্তুতঃ, বাংলা নাটকের উদ্ভবের মূলে ইংরেজী নাটক ও মঞ্চাভিনয় প্রধানতঃ প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল। যাত্রার ক্রমপরিণতিতে বাংলা নাটকের সৃষ্টি হল না, তবে বাংলা নাটক যাত্রার প্রভাবকে একেবারে অস্বীকারও করতে পারল না।

॥ ৪ ॥

ইংরেজী নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে দেখি মধ্যযুগীয় ধর্মমূলক Mystery ও Miracle play থেকেই কালক্রমে আধুনিক নাটকের সৃষ্টি হয়েছিল। Comedy ও Tragedy এই

Mystery ও Miracle-এরই ক্রমপরিণত রূপ। কিন্তু বাংলা নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে আমরা এই রীতির ব্যতিক্রম লক্ষ্য করি। ধর্মমূলক 'যাত্রা' পালাগুলি থেকে বাংলা নাটকের সৃষ্টি সম্ভব হয়নি। এর প্রধান কারণ এই যে, রেনেশাঁর প্রভাবে মধ্যযুগীয় সকল অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারমুক্ত নবপ্রবুদ্ধ ইয়োরোপে যে মানবিক চেতনার অভ্যুদয় হয়েছিল, সে দেশের নাট্যসাহিত্যেও এই নবলব্ধ জীবনচেতনাকেই সার্থক নাট্যরূপ দিতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশের যাত্রাপালাগুলির ধর্মাতিশয্য ও অতিরিক্ত সঙ্গীত প্রাধান্য যথার্থ নাটকীয়তা সৃষ্টির অনুকূল ছিল না। ধর্মমোহ ও শাস্ত্রানুগত্য এই যাত্রাগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। সুতরাং জীবনমুখী নাটক রচনার উপাদান হিসেবে এইসব পৌরাণিক দেবমাহাত্ম্যমূলক কাহিনীগুলি আধুনিক নাট্যকারদের কাছে কোন আবেদন সৃষ্টি করতে পারেনি। সচেতন জীবনজিজ্ঞাসাই আধুনিকতার লক্ষণ। অতএব পাশ্চাত্য সাহিত্য-সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে যখন থেকে এদেশে জীবনজিজ্ঞাসা জাগ্রত হয়েছে তখন থেকেই সাহিত্য শিল্পের অন্যান্য ধারার মত নাটকেরও উদ্ভব হয়েছে।

এ পর্যন্ত আলোচনা থেকে আমরা লক্ষ্য করলাম যে, যাত্রার মধ্য দিয়ে বাঙালীর নাট্য স্বভাব পূর্ণাঙ্গ শিল্পরূপ লাভ করতে পারেনি। যাত্রার সঙ্গীত বাহুল্য এবং ধর্মাতিশয্য প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি প্রচলিত জনরুচিরই পোষকতা করে এসেছিল কিন্তু নাট্যরুচিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। তবুও একথা অনস্বীকার্য যে বাঙালীর জাতীয় চেতনায় যে নাট্য ঔৎসুক্য সৃষ্টি হয়েছিল তার পিছনে অংশতঃ যাত্রার অবদানও অনস্বীকার্য। ইংরেজী নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে যেমন প্রাচীন Mystery ও Miracle থেকেই কালক্রমে Tragedy ও Comedyর উদ্ভব সম্ভব হয়েছিল বাংলা নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে তেমন ঘটনা ঘটল না। লক্ষ্য করেছি, বাংলাদেশে প্রচলিত যাত্রা একাধিক কারণে আধুনিক বাংলা নাটকের ঐতিহ্য হতে পারেনি। কারণগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করলে মোটামুটি এ-রকম দাঁড়ায়,—

এক, যাত্রা গানের অতিরিক্ত সঙ্গীত বাহুল্য। সঙ্গীত যাত্রার প্রাণ, এই কারণে, যাত্রার পরিচয়সূচক 'গান' এই পদটি অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়ে আছে। যাত্রার গানগুলি নির্দিষ্ট থাকত। মাঝে মাঝে যেখানে কথোপকথনের প্রয়োজন হত, অভিনেতারাই তখন সে কথাগুলিকে তাৎক্ষণিক রীতিতে তৈরী করে নিত। পরমানন্দ সর্বপ্রথম যাত্রায় সঙ্গীত সর্বস্বতাকে অপসারিত করে কিছু কথোপকথন ব্যবহার প্রবর্তন করেছিলেন। তথাপি যাত্রার মুখ্য আকর্ষণ ছিল, কথা নয়, সঙ্গীত। পরমানন্দ যাত্রায় কীর্তনাঙ্গের 'তুক্কো' প্রবর্তন করেছিলেন, পরবর্তী কালে যা বিভিন্ন যাত্রাকারের হাতে নানাভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। প্রসঙ্গতঃ, বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি পালায় চুট্‌কী জাতীয় গানগুলির জনপ্রিয়তা স্মর্তব্য।

দুই, শিক্ষিত বাঙালীর সঙ্গে সাধারণ জনগণের রুচিগত বৈপরীত্যের বিরাট ব্যবধানটি এ-প্রসঙ্গে আলোচ্য। অশালীন অঙ্গভঙ্গী, ভাঁড়ামি, অশ্লীল উক্তি-প্রত্যুক্তি ও অমার্জিত বেশবাস যা সাধারণ দর্শককে আনন্দ দিত তা পরিশীলিত মার্জিত রুচির দর্শকের কাছে ছিল ঘৃণার্হ। অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি যে, প্রাচীনপন্থী রামনারায়ণ তর্করত্নও তাঁর রত্নাবলীর ভূমিকায় যাত্রা সম্পর্কে বিরূপ মত প্রকাশ করে ইংরেজী ও সংস্কৃত আদর্শের নাট্যরীতির সপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বাংলাদেশে প্রচলিত এই অমার্জিত রুচির নাট্যাভিনয়ের প্রাচুর্য লক্ষ্য করেই মধুসূদন সম্ভবতঃ তাঁর 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের ভূমিকায় বিখ্যাত খেদোক্তিটি করেছিলেন।

"অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।"

তিন, ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত নব্যশিক্ষিত সমাজের সপ্রশংস-দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল ইংরেজী এলিজাবেথীয় যুগের মার্জিত রুচির সাহিত্যের উপর। সুতরাং অতি সঙ্গত কারণেই সদ্য আলোকপ্রাপ্ত ও ইংরেজী সাহিত্যের রসাস্বাদপুষ্টরসনা প্রাচীন যাত্রায় রসপরিতৃপ্তির অভাব লক্ষ্য করেছে। যাত্রা বিষয়টিকে শিক্ষিত সমাজ নাটকের 'অপভ্রংশ' বলেই মনে করেছেন।

চার, উল্লিখিত বহিরঙ্গ কারণগুলি ছাড়াও অন্তরঙ্গ কারণগুলি মূলতঃ জীবনাদর্শগত। যাত্রার মূল বিষয় ধর্মভিত্তিক। উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত যাত্রা পালাগুলির বিষয়বস্তু ছিল ধর্মমূলক। কৃষ্ণলীলা, চৈতন্যলীলা, চণ্ডীযাত্রা বা রামযাত্রা ইত্যাদি। উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই যুগরুচি অনুযায়ী কলকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যাত্রার বিষয়-বস্তুর মধ্যে কিছুটা বৈচিত্র্য দেখা দিতে থাকে। যেমন কৃষ্ণলীলা, চৈতন্যলীলা-দেবলীলার স্থলে দক্ষযজ্ঞ, ধ্রুবচরিত্র, কমলে কামিনী, নলদময়ন্তী, শ্রীবৎসচিন্তা ইত্যাদি পৌরাণিক উপাখ্যান এবং বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর মত লৌকিক আদিরসপূর্ণ কাহিনী অধিক আদৃত হত। কিন্তু এই যাত্রাগুলি নির্দোষ ও সর্বাংশে মার্জিত রুচির অনুকূল ছিল না। জনরুচিকে তুষ্ট করতে গিয়ে নাচগানের বাহুল্য, সঙের ও ভাঁড়ামির আধিক্যে তা হয়ে পড়েছিল অতি তরল। আবার এসময়েই অন্যদিকে কৃষ্ণকমলের মত যাত্রাকার কর্তৃক যাত্রাগানকে অশ্লীলতা মুক্ত করবার উদ্দেশ্যে বিশুদ্ধ ভক্তিরসের নিষেকে কৃষ্ণযাত্রাকে পুনরুজ্জীবিত করবার প্রয়াস লক্ষ্য করি। সুতরাং মধ্যযুগীয় ধর্মপ্রভাব উনিশ শতকের যাত্রাপালা থেকে একেবারে অন্তর্হিত হয়েছিল, একথা বলা যায় না। আধুনিক যুগের লক্ষণ প্রকাশিত হয়েছে ব্যক্তি চেতনায়। মানবতাবাদই উনবিংশ শতাব্দীর অন্তর্নিহিত প্রাণধর্ম। মধ্যযুগীয় ধর্মনির্ভরতা আধুনিক যুগাভিমুখে বিবর্ণ হয়ে আসছিল। কবিগানের মধ্যেই এই মানস পরিবর্তনের স্তর

পরম্পরা লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন যাত্রার প্রতি নব্য বাংলার অনীহা এ-যুগের অন্যতম প্রধান লক্ষণ।

পাঁচ, যাত্রা ও নাটকের উপস্থাপনা রীতির পার্থক্য সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে।

(ক) যাত্রাগানের অভিনয়-অনুষ্ঠানের জন্য বাংলাদেশে কোথাও স্থায়ী মঞ্চ ব্যবস্থা ছিল না। ভ্রাম্যমাণ এই যাত্রাদলগুলি অস্থায়ীভাবে আসর নির্মাণ করে চিত্ত-বিনোদনের ব্যবস্থা করত। স্থায়ী মঞ্চ নির্মাণ করবার কোন প্রয়োজন চিন্তাও সম্ভবতঃ তখন অনুভূত হয়নি। বাংলাদেশে স্থায়ী রঙ্গালয় বা মঞ্চ নির্মাণ করে তাতে নাটক অভিনয়ের সূত্রপাত হয় বিদেশীদের হাতে। নাট্যাভিনয়ের মঞ্চস্থাপনার মুখ্য এবং প্রধান প্রেরণা যেমন ইংরেজদের কাছ থেকেই এসেছে তেমন বাংলাদেশের রঙ্গালয়ে অভিনয়োপযোগী নাটক রচনার প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণাও ইংরেজী শিক্ষা ও ইংরেজী নাটক থেকেই এসেছে।

(খ) যাত্রাগানে নাটকের স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাভাবিকতার অভাব অত্যন্ত প্রকট। কৃত্রিমতা ও নৃত্যগীতাদির আত্যন্তিকতা স্বাভাবিকতার পরিপন্থী।

ছয়, যাত্রা ও নাটকের ভাবগত বৈসাদৃশ্য। নাটকে জীবনের যে অন্তর্গূঢ় বেদনা মূর্ত করা হয় যাত্রায় সেই অন্তর্রহস্যের জটিলতার অপেক্ষাকৃত ন্যূনতা। ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী শেক্সপীয়রের নাটকের কাব্য-মাধুর্য ও মানবজীবনের অতিবিচিত্র রসসম্ভার মুগ্ধ ও বিস্মিত। তাঁদের কাছে যাত্রার জীবন বিমুখতা ও নিস্তরঙ্গ ধর্মনির্ভরতা কোন আবেদন সৃষ্টি করতে পারেনি। এ-প্রসঙ্গে ডঃ সুশীলকুমার দের অভিমতটি প্রণিধানযোগ্য—

"The prevalence of the rigoristic (samnyas) ideal and the natural prominence gives to Sattvik over the rajasik qualities fostered indifference to mundane activities and an absorption in superdane affairs which materially hampered free expansion of art, soi and literature."[৪৮]

সুতরাং বাংলা নাটকের উৎপত্তিতে যাত্রা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারে "বঙ্গীয় নাট্যশালা ও নাটকের উৎপত্তি ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালীদের দ্বারা বিদেশী আদ কথাটি স্মরণ রাখা উচিত। পুরাতন যাত্রার সহিত বাংলা নাটকের কোন নাড়ীর নাই। যাত্রা হইতে বাংলা নাটকের উদ্ভব হয় নাই, বরং নব্য নাটকের প্রভাবেই রূপান্তর ঘটিয়াছিল।"[৪৯]

—সমালোচকের উদ্ধৃত মন্তব্যটি বিতর্ক নিরপেক্ষ নয়। অনেক প্রথিতযশা সমা

উদ্ধৃত মন্তব্যটিকে সর্বাংশে স্বাগত জানাতে পারেন'নি, বিশেষতঃ এই কারণে যে, এই মন্তব্যে বাংলা নাটকের উৎপত্তির মূলে যাত্রার প্রভাবকে অস্বীকার করা হয়েছে। ইতিহাসের আলোচনায় আমরা লক্ষ্য করেছি, বাংলাদেশে প্রচলিত 'যাত্রা' জাতীয় নিতান্ত ধর্মভিত্তিক সঙ্গীতবহুল গীতাভিনয় ও মঞ্চে অভিনেয় 'নাটক'-এই দুটি ধারাকে দুটি স্পষ্ট নিরূপিত বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যাত্রার সঙ্গীত বাহুল্য এবং সারল্য ও অতি নাটকীয়তা প্রথম যুগের নাট্যস্রষ্টাদের একেবারেই প্রভাবিত করেনি, এমন কথা মনে করবার কোন সঙ্গত কারণ দেখি না। যদি লেবেডেফকে বাংলাদেশে বাংলা নাটকের উদ্গাতা বলে ধরে নিই তাহলে একথা প্রতিষ্ঠিত হয় যে, বাংলা নাটক ইংরেজী নাটকের আদর্শে সৃষ্ট। তা ছাড়া পরবর্তী কালে একমাত্র নবীনচন্দ্র বসুর নাট্যমঞ্চে 'বিদ্যাসুন্দর' ছাড়া যাত্রার বিষয় নিয়ে সৃষ্ট অন্য কোন নাটক কোথাও অভিনীত হয়েছে বলে জানি না। তবু একথা অনস্বীকার্য যে, 'যাত্রাগানে'র কিছু কিছু প্রভাব পরবর্তী বাংলা নাটকে নানা-ভাবেই পড়েছে। লেবেডেফ তাঁর 'কাল্পনিক সংবদল' (Disguise) নাটকে ভারতচন্দ্র থেকে গান সংযোজন করেছেন। 'নাটকে' সঙ্গীত সংযোজন 'যাত্রা'রই স্পষ্ট প্রভাব মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। তাছাড়া প্রথমযুগের বাংলা নাটকে দীর্ঘ সংলাপ, সংলাপে গুরুগম্ভীর শব্দ প্রয়োগ ও তদ্দ্বারা চমকসৃষ্টির চেষ্টা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কবিত্ব এই যাত্রারই প্রতিধ্বনি স্বরূপ। বাংলা নাটকের সৃষ্টিতে ইংরেজী আদর্শই কার্যকরী হয়েছিল। আবার একথাও সমান সত্য যে বাংলা নাটকের আবির্ভাবে চিরাচরিত 'যাত্রা গান' স্বীয় বৈশিষ্ট্য হারিয়ে নাটকীয়তাকে (theatrical element) নিজ অবয়বে ধারণ করতে বাধ্য হল। বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেও নিছক 'ধর্ম' নিয়ে যাত্রা বেঁচে থাকল না, লোক জীবনের জটিলতাও যাত্রার বিষয়ীভূত হল। এই সূত্রে ডঃ সুকুমার সেনের প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি উদ্ধারযোগ্য। "বিলাতি ষ্টেজ-অভিনয় দেখিয়াই আমাদের দেশের লোকেরা নাটক লেখায় উৎসাহিত হয়েছিলেন। নাটক বলিতে এখন যাহা বুঝি তাহা আমাদের দেশে ইংরেজ আমলের আগে ছিল না। তাহার সহিত নাটকের খানিকটা মিল আছে নিশ্চয়ই, অমিলও আছে অনেকটা। বাঙ্গালা নাটকের উৎপত্তি যাত্রা হইতে হয় নাই, তবে যাত্রার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল।"[৫০]

সাত, যাত্রা ও নাটকের মধ্যে চারিত্রিক বৈপরীত্য বিদ্যমান। নাটকে কোন একটি নির্দিষ্ট কাহিনীকে অবলম্বন করে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে নাটকীয় চরিত্রের বিকাশ দেখানো হয়। কিন্তু যাত্রায় কোন নাট্যদ্বন্দ্বের (conflict) স্থান নেই। যাত্রায় চরিত্রসমূহের পরিণতি তাহাদের চিন্তা ও কর্মদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না, সেখানে অলৌকিক দৈবনির্ভরতাই মুখ্য স্থান অধিকার করে। সুতরাং নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টির দ্বারা মানব-

জীবনের বিচিত্র রসাস্বাদনস্পৃহাই শিক্ষিত জনমানসকে প্রভাবিত করেছিল অধিক পরিমাণে।

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে এসে প্রচলিত আদর্শ ও সংস্কারমুক্ত হয়ে শিক্ষিত জনসমাজ যখন বাস্তব জীবনের প্রতি আগ্রহী ও কৌতূহলী হয়েছে তখন থেকেই প্রকৃত বস্তুনিষ্ঠ বাংলা নাটকের সৃষ্টি সম্ভব হল। বাংলা নাট্যচর্চার প্রথমযুগে ইংরেজী ও সংস্কৃত (বাংলা নবজাগরণের লক্ষণ—revival of oriental learning, growth of Bengali Language and increasing urge of English education) নাটক অনুবাদ ও অভিনয়ের দ্বারা ধীরে ধীরে ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছিল। সমসাময়িক সামাজিক বিভিন্ন প্রথা ও সংস্কারকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রহসন ও নাট্যচিত্রগুলি বাস্তবধর্মী পূর্ণাঙ্গ নাটকের আবির্ভাবের পূর্বে বৈতালিকের কাজ করেছিল।

সূত্র নির্দেশিকা

১. "The drama bears, therefore, essential traces of its connexion with the Brahmins. They were idealist in outlook, capable of large generalizations, but regardless of accuracy in detail, and to create a realistic drama was wholly incompatible with their temperament."

—*The Sanskrit Drama* : A. B. Keith ; p. 276.

এই মতের সমর্থন অন্যত্রও পাওয়া যায়,—

"The Indian drama can not be described as national in the broadest and highest sense of the word ; it is in short, the drama of a literary class, though as such it exhibits many of the noblest and most refined, as well as of the most characteristic, features of Hindu religion and civilization."

—*Encyclopaedia Britannica* : Cambridge Edition.

২. The traditional existence of Yatras is known to us from time immemorial and in Bharata's Natya-Sastra, we hear of popular Semi-dramatic performances which have been generally regarded as the probable precursor of the popular Yatras."

—*Bengali Literature in the 19th Century*: Dr. S. K. De; p. 401.

৩. হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা: হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত, পদসংখ্যা—১৭। 'অবদান শতকম': কুবলয় জাতকে দক্ষিণাপথ থেকে আগত এক নাট্যাচার্য কর্তৃক শোভাবতীর রাজসভায় 'বুদ্ধ-নাটক'-এর অভিনয় কথা লিখিত হয়েছে।

৪. "The dramas of the ritual, therefore, are in a sense somewhat out of the main line of the development of the drama; the popular side has survived through the ages in a rough way in the Yātrās well known in the literature of Bengal,..."

The Sanskrit Drama: A. B. Keith; p. 16

৫. "এই নাটকগুলির কোন কোনটি সংস্কৃত বা প্রাকৃত সংলাপ ব্যবহার করেছে ও গীতে প্রাদেশিক ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেছে, কোন কোনটি শুধু নান্দী বা প্ররোচনায় সংস্কৃত ব্যবহার করেছে; সংলাপ ও গীতে প্রাদেশিক ভাষা বা বৈষ্ণবদের 'সরকারী' ভাষা ব্রজবুলির সাহায্য নিয়েছে।"

—বাংলা নাটকের বিবর্তন: ডঃ সুরেশচন্দ্র মৈত্র; পৃ. ৩৯।

৬. ১৩২২ সালে নেপালে নেওয়ারী অক্ষরে লেখা, কিন্তু বাংলা ভাষায় রচিত চারটি নাটক পাওয়া গেছে। ১. কাশীনাথের 'বিদ্যাবিলাপ'; ২. কৃষ্ণদেবের 'মহাভারত'; ৩. গণেশের 'রামচরিত' ও ৪. ধনপতির 'মাধ্বানল-কামকন্দলা'। এছাড়া নেপালের ললিতাপুরের সিদ্ধিনরসিংহ মল্লের রাজ্যকালে রামভদ্র (ও রবিকর?) রচিত 'হরিশ্চন্দ্র-নৃত্য' এবং 'গোপীচন্দ্র নাটকের' সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। সিদ্ধিনরসিংহ মল্লের সমকালীন ভাতখাঁও (১৬৫১) রাজবংশের নৃপতি জয়জগজ্জ্যোতি-মল্লের রচিত (?) নাটক 'মুদিতকুবলয়াশ্ব' নাটক (১৬২৮) এবং 'হরগৌরী-বিবাহ' নাটক (১৬২৯)। জগজ্জ্যোতি মল্লের নামে প্রচারিত আরেকটি নাটক 'কুঞ্জবিহারী নাটক'। (দ্রষ্টব্য:—নট-নাট্য-নাটক: ডঃ সুকুমার সেন; পৃ. ৭৬-৯৪)

"নেপাল-রাজসভায় সংস্কৃত নাটকের অনুশীলন অনেকদিন থেকেই ছিল, হরি (হর) সিংহ মিথিলা ছেড়ে উত্তরে চলে যাওয়ার পরে,, বিশেষতঃ তাঁর পরিবারের সহিত নেপাল রাজ পরিবারের বিবাহ সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পর থেকে। নেপালের রাজকবিদের লেখা নাটক দ্বাদশ শতাব্দী থেকে পাওয়া যাচ্ছে। গোড়ার দিকের নাটকগুলি প্রায় সবই রাম-কথা নিয়ে। এগুলি পুরাপুরি সংস্কৃতে লেখা, তবে "সঙ্গীত নাটক"। অর্থাৎ গান

আছে তবে সংস্কৃতে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ থেকে নেপাল-রাজসভার সঙ্গীত নাটকে দেশীভাষায় (মৈথিল, ব্রজবুলি, ভাঙা বাংলা) গান পাওয়া যাচ্ছে, এবং প্রায় গোটাগুটি বাংলায় অথবা মৈথিলে লেখা নাটপালা মিলছে। নেওয়ার বংশের শেষ রাজা রণজিত মল্ল পর্যন্ত সব রাজাই নাট্যকর্মের পোষকতা করে এসেছেন। কেউ কেউ নাটক লিখেছেনও। (সম্ভবত এ রচনাগুলি রাজ কবিদের লিখে দেওয়া।)"

—তদেব ; পৃ. ৭৬-৭৭।

নাটকাখ্যাত এই রচনাগুলির নাটকীয়তা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়,—

"এই বইগুলি নাটকের আকারে লেখা ; কিন্তু আমরা যাহাকে নাটক বলি এ সেরূপ নাটক নয়। একটি দুটি পাত্র প্রবেশ করিতেছে, আর এক একটি গান করিয়া চলিয়া যাইতেছে।"

—নেপালে বাঙ্গালা নাটক : সম্পাদনা ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ. ভূমিকা ৵০-৶০।

৭. 'বঙ্গদেশী এক বিপ্র প্রভুর চরিতে।
নাটক করি লঞা আইল প্রভুকে শুনাইতে॥'

নাটকটি সম্ভবতঃ সংস্কৃতে রচিত ছিল। কৃষ্ণদাস ঐ নাটকের নান্দী শ্লোকটি গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন,—

"বিকচকমলনেত্রে শ্রীজগন্নাথসঙ্জে
কনকরুচিরিহাত্মন্যাত্মতাং যঃ প্রপন্নঃ।
প্রকৃতি জড়মশেষং চেতয়ন্নাবিরাসীৎ
স দিশতু তব ভব্যং কৃষ্ণচৈতন্য দেবঃ"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত : কৃষ্ণদাস কবিরাজ ; অন্ত্যলীলা—পঞ্চম অধ্যায়।

৮. 'চণ্ডী' নাটকের মোট ৩/৪ পৃষ্ঠার বেশী সম্ভবত ভারতচন্দ্র লেখেন নি। রচনা অসম্পূর্ণ। সূত্রধার-নটী এবং মহিষাসুর এবং ভগবতী মিলে মোট ছ'টি উক্তি এ মহিষাসুরের প্রবেশ সূচক একটি বর্ণনা এই নাটকের সর্বাংশ। বাংলা-হিন্দী-সং মিলিয়ে মিশ্রভাষায় রচিত 'চণ্ডীনাটক' প্রকৃত নাটকের আদর্শে রচিত হয়েছিল মনে হয় না।

দ্রঃ—ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী : বসুমতী সংস্করণ ; পৃ. ২০৮-২০৯।

৯. দ্রষ্টব্য, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড (পূর্বার্ধ) : ডঃ সুকুমার সেন ; পৃ.

১০. ..."We find, during the Muhammadan rule in the provi

dramatic performances could not flourish because these as objective shows with abundant music and dancing jarred against the religious doctrines they held so dear."

—*Western Influence in Bengali Literature* : Priya Ranjan Sen ; p. 142.

১১. "Generally, indeed, we know of no Mahomedan nation that has accomplished, anything in dramatic poetry, or even had any notion of it."

—*Dramatic Art & Literature* : Schlegel ; p. 34.

১২. "কেউ কেউ বলেন, মুসলমান শাসনের ফলে অভিনয় কলা নিষিদ্ধ হয়ে পড়লে সমগ্র মধ্যযুগেই ভারতবর্ষে নাট্যাভিনয় অপ্রচলিত হয়ে পড়ল। আরও একটা সম্ভাব্য কারণ—সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা লোকব্যবহার থেকে স্খলিত হওয়ার জন্য ঐ ধরনের নাটকের অভিনয় ক্রমে ক্রমে অভিজাত সমাজ থেকে লুপ্ত হয়ে গেল।"

—পুরাতন বাংলা নাটক সংকলন : ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। ভূমিকা-পৃ. গ।

১৩. নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার ; ২য় খণ্ড : ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য ; পৃ. ২২৩।

১৪. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন : বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বৎবল্লভ সম্পাদিত ; ভূমিকা-পৃ. ১৵।

১৫. "*Gitagovinda* which written by Jayadeva under Laksmanasena in the twelfth century A. D., exhibits songs sung by Kṛṣṇa, Rādhā, and her companion, intermingled with lyric stanzas of the poet, describing their position, or the emotions excited, and addressing prayer to Kṛṣṇa. The work is a poem, and can be enjoyed simply as such, but it is also capable of a quasi-dramatic presentment. It reveals highly developed outcome of the simple Yātrās of the Kṛṣṇa religion."

—*The Sanskrit Drama* : A. B. Keith ; p 272.

১৬. "গীতগোবিন্দ আসলে গীতিনাট্য। যদিও সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রসম্মত মহাকাব্যের পোষাক পরানো আছে তবুও মৌলিক নাট্যরূপটি...ধরা কঠিন নয়..."

—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড : (পূর্বার্ধ) ডঃ সুকুমার সেন ; পৃ. ৪২।

১৭, "Of great importance in this regard is the persistence in popularity of the Yātrās. which have survived in the decadence of the regular Sanskrit drama. They tell of the loves of Kṛṣṇa and Rādha. his favourite among the Gopīs,···Kṛṣṇa is by no means a faithful lover, but the end is always the fruition of Rādhās love for him. And in Jayadeva's *Gitagovinda* we have in literary form the expression of the substance of the Yātrā, lyric songs, to which must be added the charms of music and the dance."

—*The Sanskrit Drama* : A. B. Keith ; p. 40.

১৮. (ক) "গীতগোবিন্দ উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক নাট্যকাব্যের ধরণে গ্রথিত হইলেও, উহাতে নাটকীয় ঘটনা অপেক্ষা মহাকাব্যোচিত স্বভাব-বর্ণনারই একান্ত আধিক্য।"

—চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন : সতীশচন্দ্র রায়, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ২৫শ ভাগ ; তৃতীয় সংখ্যা।

(খ) ···"গীতগোবিন্দকে ঠিক দেশীয় গীতিনাট্য শ্রেণীর রচনাও বলা যায় না। ভাব প্রবণতায় ও গীতিবাহুল্যে দেশীয় গীতাভিনয়ের সহিত সাদৃশ্য থাকিলেও প্রাচীন কৃষ্ণ-যাত্রাদির সহিত ইহার যথেষ্ট পার্থক্যও রহিয়াছে। ইহার নাট্যবস্তু যৎসামান্য এবং যাত্রাদির মত ইহা সাময়িক প্রেরণায় রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। উৎসবাদিতে-জনসাধারণের চিত্তবিনোদনের জন্য লিখিত ও ব্যবহৃত হইলেও ইহা নিপুণ শিল্পীর স্বেচ্ছাকৃত লিপিকুশলতায় সমৃদ্ধিশালী ; রাগবহুল, প্রাঞ্জল ও স্বচ্ছন্দ হইলেও ইহার রচনা নিখুঁত ও নিপুণ শিল্পের পরিচায়ক।"

—কবি জয়দেব ও গীতগোবিন্দ : হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ; ভূমিকা, পৃ. ৬৪-৬৫।

১৯. চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন : সতীশচন্দ্র রায়, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ২৫ ভাগ ; তৃতীয় সংখ্যা।

২০. বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা, ২য় খণ্ড : ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ. ২৬।

২১. (ক) "পাঁচালী হইতেই যাত্রার উদ্ভব'।—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস : ডঃ সুকুমার সেন।

(খ) "···ক্রমে ক্রমে পাঁচালীর প্রসার ও পালাগানের দীর্ঘতার ফলে একজনের স্থলে দুই বা ততোধিক গায়ক ও অভিনেতার আমদানি হইতে লাগিল। এইভাবে পাঁচালীর বৈচিত্র্য ও বিস্তৃতি ঘটিতেছিল এবং কালক্রমে এই পাঁচালী হইতেই জনপ্রিয় যাত্রা-গানের উদ্ভব হইল।"

—বাংলা নাটকের ইতিহাস : ডঃ অজিতকুমার ঘোষ ; পৃ. ৯।

২২. বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস : ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য (প্রথম খণ্ড) ; পৃ. ৭১।

২৩. বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ : মন্মথমোহন বসু ; পৃ. ৪৮-৪৯।

২৪. দ্রষ্টব্য, বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা : ডঃ বৈদ্যনাথ শীল ; পৃ. ১০০।

২৫. "In the first place, the Yatra generally possessed a religious or mythological theme, pointing to a probable connexion with religious festivities and ceremonies. In the next place, although there always existed a dramatic element, the song element absolutely preponderated, and the choral peculiarities threw into shade its mimetic qualities."

—*Bengali Literature in the 19th Century* : Dr. S. K. De ; p. 402.

২৬. "The decline of faith in the vedic sacrifices and rituals and the substitution in its place of sectarian religious and numerous ceremonies and festivals connected therewith, continued during the middle age...The Tantric religion also flourished very much and its mantras, mudras and mandalas acquired wide popularity. Even the three popular orthodox Hindu religions mentioned above (Saivism, Saktism and Vaishnavism) were subjected to Tantric influence."

—*History of Mediaevel Bengal* : Dr. R. C. Mazumder ; p. 195.

২৭. "In early Bengali literature prior to Chaitanya, no doubt, there prevailed songs relating to Saiva and Sakta cults ; and it is probable that with these prevailed also Siva-yatra and Chandi-yatra, traces of which we find even in 18th century,"...

—*Bengali Literature in the 19th Century* : Dr. S.K. De ; p. 408.

২৮. "The Hindus of Bengal were infused with a new life by the example and ideal of Chaitanya, and the moral uplift that he had brought about all round."

—*History of Mediaevel Bengal* : Dr. R. C. Mazumder ; p. 202.

২৯. "It is extremely difficult, in the absence of data to speak confidently on the subject ; but it seems that in course of time, with the advent of Baisnab ideas, Kṛṣṇa-Yatra over shadowed all other kinds and became absolutely supreme."

—*Bengali Literature in the 19th Century* : Dr. S.K. De ; p.408.

৩০. অদ্বৈত মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন—"মোরে আজ্ঞা প্রভু কোন কা কাচিবার ?" তদুত্তরে মহাপ্রভু অদ্বৈতকে বলেন—"ইচ্ছা অনুরূপ কাচ কাচ আপনার।"

—শ্রীচৈতন্য ভাগবত : বৃন্দাবন দাস ; মধ্য খণ্ড, ১৮শ অধ্যায়।

৩১. বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ : মন্মথমোহন বসু ; পৃ. ৪৭।

৩২. "Sri Chaitanya was a living protest incarnate against (this defilement of ideal love. His vigorous manliness, spiritual fervour and singular personality raised the Vaishnava religion founded on th love of Radha and Krishna to a high pedestal. The visual experienc of his inordinate devotion to God, his maddening Krishna-Radh songs, and the realisation in his own life of the highest ideal of t pure love of Radha and Krishna washed away like a torrent all t accumulated pollution in Vaishnavism and infused new life into t religion."

—*History of Mediaevel Bengal* : Dr. R. C. Mazumder ; p. 20

৩৩. "The influence of Baisnavism, therefore, was hardly favo rable to the development of the inherent dramatic elements of t Yatra ; on the other hand it cherished its Musical Peculiaritie developed its melodramatic tendency, and emphasised its religio predilections."

—*Bengali Literature in the 19th Century* : Dr. S. K. De ; p. 449-45

৩৪. বিশ্বকোষ ; ১৫শ খণ্ড (যাত্রা) পৃ. ৬৯৭।

৩৫. বর্ধমান সম্মিলনী সুবর্ণজয়ন্তী স্মরণিকা—১৩১৪-৬৪ ; শ্যামাপদ চক্রবর্তী।

৩৬. দ্রঃ বিশ্বকোষ, ১৫শ খণ্ড (যাত্রা) পৃ. ৬৯৯।

৩৭. "প্রায় আড়াইশত বৎসর পূর্বে কীর্তন, মঙ্গল গান ও ঝুমুর মিশাইয়া নাটকের অনুসরণে বর্তমান কালীয়দমন যাত্রার সৃষ্টি হয়।"

—কালীয়দমন যাত্রা ও নীলকণ্ঠ—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ; শারদীয়া যুগান্তর, ১৩৫৯।

৩৮. বিবিধার্থ সংগ্রহ ; মাঘ, ১৮৫৯।

(সুশীল রায় সম্পাদিত 'বঙ্গ প্রসঙ্গ' গ্রন্থের 'কুনীতি ও সুনীতি' শীর্ষক প্রবন্ধ।)

৩৯. *Indian Stage* : H. N. Dasgupta ; p. 116.

৪০. *"It is to keep pace with these Gobinda had to introduce new style"*. Ibid, p. 122.

৪১. বিশ্বকোষ, ১৫শ খণ্ড (যাত্রা) ; পৃ. ৭০৮।

৪২. "...মণিপুরের এক সম্প্রদায় যাত্রা-ওয়ালা সংপ্রতি আসিয়াছে ইহারা এই কলিকাতার মধ্যে কোন২ স্থানে যাত্রা করিয়াছে কেহ২ দেখিয়া থাকিবেন।"

—সমাচার দর্পণ, ১১ আগস্ট, ১৮২৬। "মেয়ে যাত্রার দল"।

৪৩. বাঙলা সাহিত্যের নবযুগ : ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত। পৃ. ১৫।

৪৪. "উনবিংশ শতাব্দের শুরু হইতে কলিকাতা অঞ্চলে প্রাচীন যাত্রা-পদ্ধতিতে একটা পরিবর্তন ঘটিতেছিল। কৃষ্ণলীলা চৈতন্যলীলা-দেবলীলার স্থলে দক্ষযজ্ঞ, ধ্রুবচরিত্র, কমলেকামিনী, নলদময়ন্তী, শ্রীবৎসচিন্তা ইত্যাদি পৌরাণিক উপাখ্যান এবং বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর মত অপৌরাণিক আদিরসাত্মক আখ্যায়িকা অধিক আদরণীয় হইতেছিল। সেই সঙ্গে নাচ-গানের বাহুল্য এবং সঙের ও ভাঁড়ামির আবশ্যিকতা দেখা দিয়াছিল।"

—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস : ডঃ সুকুমার সেন ; (২য় খণ্ড) পৃ. ১০৮।

৪৫. 'কি মেহতর, কি ভিস্তি, কি মালিনী, কি বিদ্যা সকলেই নৃত্যদ্বারা দর্শক মণ্ডলীর তুষ্টি সাধন করিতে প্রয়াস পাইত।"

"যাত্রায় কৃষ্ণের নৃত্য, রাধার নৃত্য, রাবণের নৃত্য, সীতার নৃত্য, কৈকেয়ীর নৃত্য প্রভৃতি রুচিকর ও সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত এবং অসম্ভাবজনক ব্যাপারের অবতারণা বড়ই কদাকার। রাধা, সীতা প্রভৃতি দেবোপম কুলবধূর, বিদ্যার ন্যায় সম্ভ্রান্ত বংশীয় রাজকন্যার এবং মালিনীর ন্যায় বৃদ্ধা ফুলওয়ালীর পক্ষে এরূপ নৃত্য যে কিরূপ বীভৎস রসের ব্যঞ্জক, তাহা সহজেই অনুমান করা যায় না।"

বিশ্বকোষ, ১৫শ খণ্ড (যাত্রা) ; পৃ. ৭১০।

৪৬. 'গুপ্তের কবিত্ব', বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী (তৃতীয় ভাগ, সাহিত্য) বসুমতী সংস্করণ ; পৃ. ৬।

৪৭. বিবিধার্থ সংগ্রহ। মাঘ, ১৮৫৯।

৪৮. *Bengali Literature in the 19th Century* : Dr. S. K. De ; p. 405.

৪৯. বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ. ৮।

৫০. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ; ২য় খণ্ড : ডঃ সুকুমার সেন ; পৃ. ৩৫।